যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলসমূহ

জন এফ বিব্বি

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠতা পুরুষেরা যখন ১৭৮৭ সালে সংবিধান রচনা করেন তখন তারা সরকার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর কোন ভূমিকার কথা চিন্তা করেননি। বস্তুতঃ তারা তারা নবীন প্রজাতন্ত্রকে রাজনৈতিক দল ও উপদলগুলো থোক দুরে রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাংবিধানিক ব্যবস্থার সন্ধান করেছিলেন, যেমন ক্ষমতার বিভাজন,ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় ফেডারেল পদ্ধতি এবং একটি নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) কর্তৃক পরোক্ষভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।

প্রতিষ্ঠাতা পুরুষদের এমন অভিপ্রায় সত্ত্বেও ১৮০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম দেশজুড়ে রাজনৈতিক দলগুলো গড়ে ওঠে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে একটি উপদল থেকে আরেকটি উপদলের হাতে নির্বাহী ক্ষমতার হস্তান্তর হতে থাকে।

রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্ভব ও ব্যাপকতা

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভোটাধিকার লাভের যোগ্যতার সংগে সম্পত্তির মালিকানা থাকার বিধান তুলে দেয়ার সাথে রাজনৈতিক দলুগলোর বিকাশ সম্পর্কিত। ভোটারদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের সংগঠিত করার একটি পন্থা বের করা দরকার হয়ে পড়লো। এই জরুরী কাজটি করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গ্রহণ করলো। এভাবেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্প্রসরাণের অংশ হিসেবে আমেরিকায় রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্ভব ঘটলো এবং ১৮৩০-এর দশকে তারা রাজনৈতিক পরিমন্ডলে দৃঢ় অবস্থান করে নিলো।

আজ রিপাবলিকান পার্টি এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। আমেরিকান নাগরিকদের আনুমানিক ৬০ শতাংশ নিজেদেরকে হয় রিপাবলিকান, না হয় ডেমোক্র্যাটিক বলে

পরিচয় দিয়ে থাকে। এমনকি যারা নিজেদেরকে স্বতন্ত্র বলে জাহির করে, তাদেরও কোন না কোন দলের প্রতি ঝোঁক আছে এবং যথেষ্ট উঁচু মাত্রায় দলীয় আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ১৯৮০ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত পাঁচটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে স্বতন্ত্রদের ৭৫ শতাংশ হয় রিপাবলিকান, না হয় ডেমোক্র্যাটিক দলীয় প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে, নিজেদের ঝোঁক অনুযায়ী। ২০০০ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকান সমর্থক ভোটারদের ৭৯ শতাংশ রিপাবলিকান প্রার্থী জর্জ ডাব্লিউ বুশকে এবং ডেমোক্র্যাটিক সমর্থক ভোটারদের ৭২ শতাংশ ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী অ্যাল গোরকে ভোট দিয়েছে।

দুটি দলের প্রভাব এখন সরকারে বিভিন্ন স্তরে পরিব্যাপ্ত। এ দুটি দল প্রেসিডেন্ট পদে, কংগ্রেসে, রাজ্য গভর্নরের আসনগুলোতে এবং রাজ্য বিধান সভাগুলোও প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। ১৮৫২ সালের পর থেকে নির্বাচিত প্রতিটি প্রেসিডেন্টই হয় রিপাবলিকান, না হয় ডেমোক্র্যাটিক দলীয় ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনগুলোতে প্রদত্ত ভোটের ৯৪.৮ শতাংশই ছিল এদুটি প্রধান দলের।

২০০২ সালের প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস নির্বাচনের পর সিনেটের ১০০টি আসনের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন স্বতন্ত্র এবং ৪৩৫ আসনের প্রতিনিধি পরিষদের মধ্যে মাত্র দুজন ছিলেন স্বতন্ত্র। রাজ্য পর্যায়ে ৫০ জন গভর্নরদের প্রত্যেকেই ডেমোক্র্যাটিক অথবা রিপাবলিকান দলের সমর্থক। রাজ্য বিধান সভাগুলোতে মাত্র ২১ জন ছিলেন স্বতন্ত্র। এসভাগুলোর আসন সংখ্যা ৭৩০০-এর চেয়ে বেশি। জাতীয় ও রাজ্য পর্যায়ে এদুটি দলই সরকার গঠন করে থাকে।

অন্য গণতান্ত্রিক দেশগুলোর চেয়ে আমেরিকান রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শগত ও কর্মসূচীগত ঐক্য তেমন সুদৃঢ় না হলেও সরকারী নীতি প্রণয়নে তারা প্রায়ই নিয়ামক ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৯৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে কংগ্রেসে রিপাবরিকান ও ডেমোক্র্যাটরা নীতিগত প্রশ্নে তাদের মধ্যকার পার্থক্য এবং সেই সংগে নিজেদের দলীয় ঐক্য তীব্রভাবে তুলে ধরেছে, যার নজির ইতিহাসে নেই। দুটি দলের মধ্যে কংগ্রেসে যে নীতিগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকে, তা প্রতি দুই বছরে পাল্টে যেতে পারে কংগ্রেসের নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদ বা সিনেটের ওপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। নীতির প্রশ্নে বিভেদ এবং পরিষদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রতিযোগিতা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ, উভয় সভাতেই এক উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ২০০৪ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় উভয় দলের কংগ্রেসীয় নেতৃবৃন্দ এবং ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরা এবং বুশ প্রশাসন ভোটে সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে বেশ কিছু কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থা কি?

দ্বিদলীয় প্রতিযোগিতা আমেরিকান রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি প্রধান দিক, যা দীর্ঘ দিন ধরে টিকে রয়েছে। ১৯৬০-এ দশকের পর থেকে রাজনীতিতে চলে আসছে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট দলে প্রাধান্য। নির্বাচনী রাজনীতিতে এই দুটি দলের প্রাধান্য এদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোগত দিক এবং আমেরিকার রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছে।

জাতীয় ও রাজ্য পর্যায়ে আইন প্রণেতাদের নির্বাচনের স্বীকৃত ব্যবস্থা হলো এই যে একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন সদস্য নির্বাচিত হবেন। এর অর্থ হলো যে প্রার্থী সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পাবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের স্থলে এই ব্যবস্থায় একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে কেবল একটি দলের প্রার্থীই নির্বাচিত হতে পারেন। এই ব্যবস্থা নির্বাচনে জয়ী হবার জন্য যথেষ্ট জনসমর্থনপুষ্ট দুটি রাজনৈতিক দল গঠনে উৎসাহ যোগায়। এই ব্যবস্থায় ছোট ছোট দলগুলো এবং কোন তৃতীয় কোন দলের বিজয়কে প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। এসব দল কোন প্রধান দলের সংগে গাঁটছড়া না বাঁধলে তাদের টিকে থাকার কোন সম্ভাবনাই নাই। আবার যৌথ প্রার্থী দেয়ার সুযোগ আছে মাত্র গুটি কয়েক রাজ্যেই।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি এনে দিয়েছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইলেক্টোরাল কলেজ বা নির্বাচক মন্ডলীর বিধান। এই ব্যবস্থায় আমেরিকানরা কোন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে প্রত্যক্ষভাবে ভোট দেন না। তারা ভোট দেন রাজ্যগুলোতে কোন না কোন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী নির্বাচকদের। প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের জন্য দরকার ৫০ টি অঙ্গরাজ্যের মোট ৫৩৮টি ইলেক্টোরাল ভোটের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের। তৃতীয় কোন দলের পক্ষে ইলেক্টোরাল কলেজের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ কেননা কোন একটি রাজ্যে কোন প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেলে, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক ভোটে হলেও, তিনি সেই রাজ্যের সবকটি ইলেক্টোরাল ভোট পেয়ে যান। নির্বাচনী এলাকায় একজন প্রার্থীর বিজয়ী হবার মতো ইলেক্টোরাল কলেজের প্রার্থী জিতিয়ে আনার ক্ষেত্রেও তৃতীয় কোন দলের সম্ভাবনা খুবই কম, তার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর জয়ী হবার কথাতো দুরের কথা।

প্রশাসন যন্ত্রের ওপর ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান দলের নিয়ন্ত্রণ থাকায় তারা আরো অনেক নির্বাচনী বিধি প্রণয়ন করেছে, যা বড় দলগুলোর অনুকূলেই কাজ করে। কোন রাজ্যের ব্যালটপত্রে তৃতীয় কোন দলের নাম অন্তর্ভুক্ত করা একটি দুরূহ কাজ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় নর্থ ক্যারোলাইনায় ২০০৪ সালের

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাজ্যের ব্যালটপত্রে তৃতীয় কোন দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত করতে ৫৮,৮৪২ জন ভোটারের স্বাক্ষর সম্বলিত দরখাস্ত পেশ করতে হয়। তাছাড়া, ফেডারেল ক্যামপেইন অ্যাক্ট-এ বড় বড় দলুগলোকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণার জন্য বরাদ্দসহ বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে, যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলোকে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার চেয়ে অনেক বেশি। আবার নির্বাচনের জন্য ফেডারেল অর্থ বরাদ্দ পেতে হলে কোন দলকে বিগত নির্বাচনে কমপক্ষে ৫ শতাংশ ভোট পেতে হয়।

আমেরিকান প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ার অনন্য ব্যবস্থা দুটি বড় দলের বাইরে কোন দলের জন্য আরেকটি অন্তরায়। বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই কংগ্রেস ও রাজ্য বিধান সভার আসনগুলোতে দলীয় প্রার্থী বাছাই করার জন্য নির্ভর করতে হয় প্রাইমারি ওপর। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়নের জন্য নির্ভর করতে হয় রাজ্য পর্যায়ে অনুষ্ঠিত দলীয় প্রাইমারিগুলোর ওপর। এই মনোয়নয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রাইমারিতে দলের ভোটাররা ভোট দিয়ে থাকে। অধিকাংশ দেশে দলের প্রার্থী বাছাই করে দল ও দলের নেতৃত্ব। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকান দলের প্রার্থী কে হবেন তা নির্ধারণ করে দলের ভোটাররা। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের তুলনায় এই ব্যবস্থায় দলীয় কাঠামো শক্তিশালী হতে না পারলেও তা নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রায় ১৫০ বছর ধরে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে। প্রাইমারি নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন লাভের মাধ্যমে দলের মুল নীতির বিরোধী কোন প্রার্থী তৃতীয় কোন দল গঠন না করেই ব্যালটে স্থান পেতে পারেন এবং নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারেন। প্রাইমারি নির্বাচন তাই দুটি প্রধান দলের মধ্যকার বিরুদ্ধ মত প্রকাশের সুযোগ করে দিয়ে তৃতীয় দল গঠনের প্রক্রিয়াকে দুরুহ করে তুলেছে। অবশ্য প্রাইমারি নির্বাচন দলের মধ্যে কখনো কখনো বিভিন্ন প্রান্তিক সামাজিক আন্দোলন বা বহিরাগত প্রার্থীদের অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেয়।

ব্যাপকভিত্তিক সমর্থন ও মধ্যপন্থী অবস্থান

নির্বাচনে আমেরিকান দলগুলো বিভিন্ন শ্রেণীর সমর্থন পেয়ে থাকে। এদের সমর্থনের ভিত্তিও ব্যাপক। আফ্রিকান-আমেরিকান ভোটারদের, যাদের ৯০ শতাংশ ২০০০ সালের নির্বাচনে ভোট দেয় ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থীকে, তাদের কথা বাদ দিলে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটরা সামজের প্রতিটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক গ্রুপের কাছ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যক সমর্থন পেয়ে থাকে। শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের সাধারণভাবে ডেমোক্র্যাট সমর্থক বলে মনে করা হলেও রিপাবলিকানরা তাদের একতৃতীয়াংশের সমর্থন আশা করতে পারে। ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকানরা শ্রমিক সংগঠনের ৪৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিল।

২০০০ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকানরা শ্রমিক সংগঠনের ভোট পেয়েছিল ৩৭ শতাংশ। আয়ের বিচারে যতোই উপরের দিকে যাওয়া যাবে, ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন ততই কমবে। তবুও ডেমোক্র্যাটরা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভোট পাওয়ার আশা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ২০০০ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী অ্যাল গোর যে ভোট পান তার ৪৩ শতাংশ ছিল এমন ভোটার যাদের বার্ষিক পারিবারিক আয় এক লাখ ডলারের বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঐক্য তুলনামুলকভাবে কম এবং কোন নির্দিষ্ট মতবাদ বা নীতিগত লক্ষ্য অনুসরণের ব্যাপারে কড়াকড়িরও অভাব রয়েছে। বরং তারা চিরাচিরতভাবে বেশি দৃষ্টি দিয়েছে নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রশাসনের কর্মী বাহিনী নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে। দলগুলো যেহেতু নির্বাচনে ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনেতিক শ্রেণীর সমর্থন পেয়ে থাকে এবং তাদের যেহেতু এমন একটি সমাজে কাজ করতে হয়, যা প্রধানত মধ্যপন্থার অনুসারী, তাই তাদেরকেও মধ্যপন্থার অনুসারী হতে হয়। নীতিগত প্রশ্নেও তাদের অনেক বেশি নমনীয়তাও প্রদর্শন করতে হয়। কোন মতাদর্শ সেভাবে অনুসরণ করেনা বলে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটরা তাদের দলের মধ্যে ভিন্ন মতের উপস্থিতি সহ্য করতে পারে এবং তৃতীয় কোন দলকে বা কোন প্রতিবাদী আন্দোলনকেও নিজেদের মধ্যে টেনে নেয়ার ক্ষমতা তাদের রয়েছে।

বিকেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক দল

আমেরিকান রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতা কাঠামের বিকেন্দ্রীভূত চরিত্র সম্পর্কে বাড়িয়ে বলার কোন প্রয়োজন নেই। ঐতিহাসিকভাবে বলতে গেলে প্রেসিডেন্টরা ধরে নিতে পারেন না যে সরকারদলীয় সদস্যরা কংগ্রেসে প্রেসিডেন্টের কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন দিয়ে যাবে বা কংগ্রেসের সরকার দলীয় নেতৃবৃন্দরাও আশা করতে পারেন না যে তাদের দলীয় সদস্যরা সব সময় কোন বিষয়ে দলগতভাবে ভোট দেবে। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট দলে কংগ্রেস ও সিনেট নির্বাচনী প্রচারণার কমিটিগুলো (প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের সদস্যদের নিয়ে এই সব কমিটি গঠিত হয়।) প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণার উদ্দেশ্যে গঠিত জাতীয় কমিটিগুলো থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করে। জাতীয় প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে কনভেনশনে প্রতিনিধি বাছাইয়ের প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা প্রয়োগ ছাড়া এদুটি দলের জাতীয় কমিটিগুলো অঙ্গারাজ্যগুলোতে দলীয় ব্যাপারে নাক গলায় না।

দলের সাংগঠনিক কাঠামোর এই বহুধা বিভক্তি অংশত আইন পরিষদ, সরকারের নির্বাহী শাখা ও বিচার বিভাগ এই তিন শাখার মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন সম্পর্কে সাংবিধানিক ব্যবস্থার ফল। সংবিধান অনুযায়ী এই তিনটি শাখা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়, তাদের কর্ম পরিধি ভিন্ন এবং এক অপরের থেকে স্বাধীন।

সরকারী ক্ষমতার এই বিভাজন দল থেকে নির্বাচিত প্রধান নির্বাহী এবং দলীয় বিধায়কদের মধ্যে দলীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তেমন উৎসাহ যোগায় না। এটা যেমন একই দলীয় প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস সদস্যদের বেলায় প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য অঙ্গারাজ্যের গভর্নর ও রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের ক্ষেত্রেও।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যবস্থার সংবিধানে রাষ্ট্রকে সাজানো হয়েছে ফেডারেল, অঙ্গারাজ্য ও স্থানীয় সরকার এই তিন স্তরে। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলোও বিকেন্দ্রীভূত হয়েছে ফেডারেল, অঙ্গারাজ্য ও স্থানীয় পর্যায়ে। প্রত্যেক স্তরেই রাজনৈতিক দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে প্রাইমারি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন ব্যবস্থা দলের সাংগঠনিক কাঠামোকে দুর্বল করে দিয়েছে কেননা প্রার্থী বাছাইয়ের ব্যাপারে দলের কোন কর্তৃত্ব থাকেনা। প্রথমত দলের প্রাইমারিতে জয়ের পর সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হবার জন্য প্রার্থীরা নিজেদের নির্বাচনী প্রচারণা চলানোর জন্য সংগঠন গড়ে তুলতে উৎসাহিত হয়। এমনকি নির্বাচনী প্রচারণা চলানোর জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজটিও প্রার্থীদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। কেননা রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক সম্পদ সীমিত এবং নির্বাচনী প্রচারণায়, বিশেষকরে ফেডারেল নির্বাচনী প্রচারণায় চাঁদা দেয়ার ব্যাপারে আইনের কড়াকড়ি রয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে আমেরিকানদের সংশয়

আমেরিকান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর দীর্ঘ ও লক্ষ্যণীয় উপস্থিতি সত্ত্বেও আমেরিকান নাগরিক সংস্কৃতির একটি অন্তর্নিহিত উপদান হলো রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি অবিশ্বাস। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কংগ্রেস ও অঙ্গারাজ্যগুলোতে প্রার্থী মনোয়নের উদ্দেশ্যে প্রাইমারি নির্বাচন এবং সম্প্রতি প্রেসডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনয়নের জন্য প্রাইমারির বিস্তার জনমনে রাজনৈতিক দল বিরোধী মনোভাবেরই পরিচায়ক। আমেরিকান জনগণ তাদের সরকারের ওপর রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা প্রয়োগকে সহজভাবে নেয়না। জনমত জরিপ থেকে বারবারই একটি বিষয় বেরিয়ে এসেছে তা হলো ভোটাররা মনে করে যে দলগুলো রাজনৈতিক ইস্যুগুলো ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করে বেশি। তারা মনে করে যে ব্যালটে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতীক না থাকলেই বরং ভালো হতো।

আমেরিকান রাজনৈতিক দলগুলোকে যে কেবল একটি বৈরি পরিবেশেই কাজ করতে হয় তা নয়, তাদের আরেকটি সমস্য হলো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটার প্রার্থীর রাজনৈতিক পরিচয়ের ওপর কম গুরুত্ব দিচ্ছেন। প্রার্থীর দলীয় পরিচয় কম গুরত্ব পাবার উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ভোটার কোন নির্বাচনী বছরে ভিন্ন ভিন্ন পদে ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রার্থীকে ভোট দেয় থাকে। ২০০০ সালের নির্বাচনে ২০ শতাংশ ভোটার প্রেসিডেন্ট পদে এক দলের প্রার্থীকে এবং প্রতিনিধি পরিষদের আসনে অন্য দলের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে।

দেখা গেছে প্রতিনিধি পরিষদের যে ৪০টি আসনে প্রেসিডেন্ট বুশ জিতেছেন, সেই আসনগুলোতে জয়ী হয়েছে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থীরা ।

বহু আমেরিকান নাগরিকের দলীয় আনুগত্য তেমন দৃঢ় নয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটার নিজেদের স্বতন্ত্র বলে বিবেচনা করে এবং বিভিন্ন দলের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে থাকে। এসব কারণে বলা যায় যে আমেরিকান নির্বাচনী রাজনীতি রাজনৈতিক দলকেন্দিক নয়, প্রার্থী কেন্দ্রিক। সরকারের নির্বাহী শাখা এবং আইন পরিষদের ভিন্ন ভিন্ন দলের নিয়ন্ত্রণ জাতীয় সরকার এবং ৫০ অঙ্গরাজ্যের সরকারের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ ব্যাপার। ১৯৮০ সালের পর থেকে চারিটি বছর বাদ দিলে সবকটি বছরেই প্রেসিডেন্ট পদ এবং কংগ্রেসের কোন একটি পরিষদ নিয়ন্ত্রণ করেছে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল। ২০০২ সালের নির্বাচনের পর ২৯টি অঙ্গরাজ্যেও (৫৮ শতাংশ) এমনটি হয়েছে।

তৃতীয় দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী

সংশ্লিষ্ট ছক থেকে দেখা যাবে যে ইতিমধ্যে যেসব অন্তরায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো সত্ত্বেও তৃতীয় দল বা স্বতন্ত্র প্রার্থীর আবির্ভাব ঘটেছে আমেরিকান রাজনৈতিক দৃশ্যপটে মাঝেমধ্যেই। প্রায়ই তারা এমন সব সামাজিক সমস্যা তুলে ধরেছে, সেগুলো প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এভাবে তারা এসব সমস্যাকে সরকারের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে্ কিন্তু অধিকাংশ তৃতীয় দলকে দেখা গেছে কোন একটি নির্বাচনকে সামনে রেখে বিকশিত হতে এবং নির্বাচনের পর মিলিয়ে যেতে অথবা বড় কোন দলের সাথে একীভূত হয়ে যেতে। ১৮৫০ সালের পর কেবল একটি নতুন দল, রিপাবলিকান পার্টিকে প্রধান একটি দলে পরিণত হতে দেখা গেছে। সে ক্ষেত্রে সামনে ছিল একটি নৈতিক সমস্যা -- দাস ব্যবস্থা, যা জাতিকে বিভক্ত করে রেখেছিল। এই বিভক্তির ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই এবং ভোটারদের সংগঠিত করা হয়েছিল।

ছকটি থেকে যদিও তৃতীয় কোন দলের দীর্ঘ দিন টিকে থাকার কোন সমর্থন পাওয়া যায়নি, তবুও এটা দেখা যায় যে এসব দল নির্বাচনের ফলাফলের ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে পারে। উদ্হরণস্বরূপ বলা যায় যে ১৯১২ সালে তৃতীয় একটি দল থেকে থিয়োডর রুজভেল্ট প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ায় রিপারলিকান ভোট বিভক্ত হয়ে যায় এবং এর ফলে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী উইড্রো উইলসন সাধারণ ভোটারদের কম ভোট পেয়েও নির্বাচিত হন।

১৯৯২ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী এইচ রস পেরো ভোটারদের একাংশ পক্ষে টানতে সক্ষম হন, যারা ১৯৮০এর দশকে রিপাবলিকান পার্টিকে ভোট দিত। এর ফলে রিপাবলিকান প্রার্থী প্রেসিডেন্ট এইচ ডাব্লিউ

বুশ পরাজিত হন। ২০০০ সালে রিপাবলিকান জর্জ যাব্লিউ বুশ এবং ডেমোক্র্যাট অ্যাল গোরের মধ্যে অত্যন্ত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে ফ্লোরিডার ব্যালটে যদি তৃতীয় দলের প্রার্থী হিসেবে রালফ ন্যাডেরের নাম না থাকতো, তাহলে হয়তো গোর রাজ্যের ইলেক্টোরাল ভোট পেয়ে যেতেন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন।

১৯৯০-এর দশকে জনমত সমীক্ষায় তৃতীয় কোন দলের প্রতি জোরালো সমর্থন লক্ষ্য করা গেছে। ২০০০ সালের নির্বাচনের প্রচারণাকালে জনমত সমীক্ষায় আমেরিকানদের ৬৭ শতাংশ প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেস ও রাজ্য বিধান সভায় রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট দলের বিপক্ষে নির্বাচনে প্রার্থী দেয়ার মতো একটি শক্তিশালী তৃতীয় দলের অনুকূলে মত প্রকাশ করে। ভোটারদের মধ্যে মধ্যে এই মনোভাব এবং সেই সংগে নির্বাচনী প্রচারণায় অকাতরে ব্যয়ের কারণে টেক্সাসের কোটিপতি রস পেরো ১৯৯২ সালে প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনে ১৯ শতাংশ ভোট পেতে সক্ষম হন। এটা ছিল বড় কোন রাজনৈতিক দলের বাইরে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রাপ্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট। ১৯১২ সালে প্রোগ্রেসিভ পার্টির থিয়োডোর রুজভেল্ট পেয়েছিলেন ২৭ শতাংশ ভোট।

তৃতীয় দলের প্রতি সমর্থনের এমন সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এমন একটি দলের পক্ষে প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী হওয়া, এমনকি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিনেটর বা প্রতিনিধি নির্বাচনের পথে বিরাট অন্তরায় রয়ে গেছে। তাছাড়া একটি তাৎপযপূর্ণ অন্তরায় হলো ভোটারদের মধ্যে এই মনোভাব যে তৃতীয় দলের প্রার্থীকে ভোট দেয়ার অর্থ ভোটটি পানিতে ফেলা। ভোটাররা যখন দেখে যে তৃতীয় দলের প্রার্থীর জয়ের কোন সম্ভাবনা নেই, তখন তারা বেছে নেয় পছন্দের দ্বিতীয় প্রার্থীকে। ২০০০ সালে প্রাক নির্বাচনী জনমত সমীক্ষায় রালফ নাদার অনুমোদনের হার ছিল জর্জ ডাব্লিউ বুশ বা অ্যাল গোরের চেয়ে বেশি। তবুও ভোটের সময় তিনি পান মাত্র ২.৭ শতাংশ ভোট। অনুরূপভাবে ১৯৯২ সালে রস পেরোর সমর্থকদের ২১ শতাংশ প্রকৃত ভোটের দিন পক্ষ ত্যাগ করে।

প্রতিবাদ হিসেবে তৃতীয় দলের প্রার্থীকে ভোট দেয়ার ঘটনাও ঘটে থাকে। ১৯৯২ সালের নির্বাচন থেকে দেখা যায় যে পেরোর ভোটারদের ৫ শতাংশ ভোটার জানায় যে তার জয়ের কোন সম্ভাবনা থাকলে তারা তাকে ভোট দিত না।

তৃতীয় দলের বা স্বতন্ত্র কোন প্রার্থী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে, বিশেষকরে কংগ্রেসের সংগে কাজ করতে গিয়ে। কারণ রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস বড় দলের বাইরের কোন প্রেসিডেন্টের সংগে সহযোগিতা করতে তেমন উৎসাহ নাও পেতে পারে।

জন এফ বিব্বি মিলওয়াকির উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রফেসর এমিরিটাস। ইতিপূর্বে তিনি আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজনেতিক দল বিষয়ক উপবিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি ও সরকার বিষযে বিশেষজ্ঞ বিব্বি "পলিটিকস, পার্টিজ অ্যান্ড ইলেকশনস" শীর্ষক গ্রন্থ রচানা করেছেন।

ইলেকোটারাল কলেজ

যখন আমেরিকান ভোটাররা ভোট দিতে যান, তখন অনেকে মনে করেন, তারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ভোটে অংশ নিতে যাচ্ছেন। কার্যত তা নয়, বিশেষকরে উনবিংশ শতাব্দীতে চালু ইলেক্টোরাল কলেজ নামে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণে।

ইলেক্টোরাল কলেজ হলো নির্বাচকদের একটি দল যারা রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মীরা মনোনীত করে। কোন না কোন প্রেসিডেন্ট পদপ্রাথীর প্রতি আনুগত্যপ্রকাশকারী এই সব নির্বাচক নির্বাচনের দিন জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ডিসেম্বরে নির্বাচকরা নিজ নিজ রাজ্যের রাজধানীতে মিলিত হয়ে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ প্রাথীদের পক্ষে ভোট দেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে হলে একজন প্রাথীকে নির্বাচক মন্ডলীর ২৭০ জনের ভোট দরকার হয়।

কোন তীব্র প্রতিদ্বন্দিতাপূর্ণ নির্বাচনে বা বহুদলের প্রাথী থাকার কারণে এমন হতে পারে যে কোন প্রাথীই ২৭০টি ভোট পেতে ব্যর্থ হলো, সেক্ষেত্রে প্রতিনিধি পরিষধ পরবতী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে।

যুক্তরাষ্ট্র সংবিধানের আর্টিকেল দুই, সেকশন ১ এর আওতায় ইলেক্টোরাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলো এই নিয়ে মৃদু বিতর্ক সৃষ্ট হলেও এই ব্যবস্থাকে নির্বাচনী ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা আনয়নকারী বিধান হিসেবে দেখা হয়।

বর্তমানে ইলেক্টোরাল কলেজ কিভাবে কাজ করে

* ৫০টি অঙ্গারাজ্যের ও ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার রেজিস্ট্রিভুক্ত ভোটাররা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বছরে নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পর প্রথম মঙ্গালবার প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ভোট দেয়।

* যে প্রাথী কোন রাজ্যে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে তিনি সাধারণতঃ সেই রাজ্যের সবকটি ইলেক্টোরাল ভোট পেয়ে যান। নির্বাচকরা নির্বাচিত প্রাথীর প্রতি তাদের অঙ্গীকার ঘোষণা করে।

* এই রাজ্যের নির্বাচকদের সংখ্যা হলো সেই রাজ্যের সিনেটর ও প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য সংখ্যার যোগফল। কংগ্রেসে ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার কোন প্রতিনিধিত্ব না থাকলেও ইলেক্টোরাল কলেজে তার তিনটি সদস্য রয়েছে।

* প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী বছরে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় বুধবারের পর প্রথম সোমবার নির্বাচকরা মিলিত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ভোট দেন। কোন প্রাথীকে নির্বাচিত হতে হলে নির্বাচকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দরকার হয়। নির্বাচকদের সংখ্যা ৫৩৮। তাই নির্বাচক মন্ডলীতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে কমপক্ষে ২৭০টি ভোটের প্রয়োজন।

* কোন প্রেসিডেন্ট পদপ্রাথীই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ব্যর্থ হলে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যরা নির্বাচক মন্ডলীতে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত তিন জন প্রাথীর মধ্যে একজনকে ভোটে নির্বাচিত করবেন। সেক্ষেত্রে প্রতিনির্ধি পরিষদের ভোটাররা রাজ্যওয়ারিভাবে ভোট দেন। প্রতিটি রাজ্যের প্রতিনিধিদলের ভোট একটি।

* কোন ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রাথী নির্বাচক মন্ডলীতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে সিনেট সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত দুজনের মধ্য থেকে একজনকে ভোটে নির্বাচিত করবেন।

প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরবর্তী ২০শে জানুয়ারি শপথ ও দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

আমেরিকান নির্বাচনী ইতিহাসে তৃতীয় দলের অবস্থান

তৃতীয় দল	বছর	সাধারণ ভোটের শতাংশ	ইলেক্টোরাল ভোট	পরবর্তী নির্বাচনে অবস্থান
অ্যান্টি ম্যাসন	১৮৩২	৭.৮	৭	হুইগ দলের প্রাথীকে অনুমোদন
ফ্রি সয়েল	১৮৪৮	১০.১	০	প্রাপ্ত ভোট ৫ শতাংশ; রিপাবলিকান সমর্থকদের

				ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
হুইগ– আমেরিকান	১৮৫৬	২১.৫	৮	দল বিলুপ্ত
সাউদার্ন ডেমোক্র্যাট	১৮৬০	১৮.১	৭২	দল বিলুপ্ত
কনস্টিটিশনাল ইউনিয়ন	১৮৬০	১২.৬	৩৯	দল বিলুপ্ত
পিপলস (পপুলিস্ট)	১৮৯২	৮.৫	২২	ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থীকে অনুমোদন
প্রোগ্রেসিভ (টি রুজভেল্ট)	১৯১২	২৭.৫	৮৮	রিপাবলিকান দলে ফেরত
সোশ্যালিস্ট	১৯১২	৬.০	০	প্রাপ্ত ভোট ৩.২ শতাংশ
প্রোগ্রেসিভ (আর লা ফোলেট)	১৯২৪	১৬.৬	১৩	রিপাবলিকান দলে ফেরত
স্টেটস রাইটস				

ডেমোক্র্যাটস	১৯৪৮	২.৪	৩৯	দল বিলুপ্ত
প্রোগ্রেসিভ (এইচ ওয়ালেস)	১৯৪৮	২.৪	০	প্রাপ্ত ভোট ১.৪ শতাংশ
অ্যাম ইনডিপেন্ডেন্ট	১৯৬৮	১৩.৫	৪৬	প্রাপ্ত ভোট১.৪ শতাংশ
জন বি. অ্যান্ডারসন	১৯৮০	৭.১	০	১৯৮৪ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি।
এইচ রস পেরো	১৯৯২	১৮.৯	০	রিফর্ম পার্টি গঠন করেন করেন এবং ১৯৯৬ সালে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
রিফর্ম (পেরো) মনোনীত	১৯৯৬	৮.৪	০	প্যাট বুকাননকে করে; প্রাপ্ত ভোট ০.৫ শতাংশ।
গ্রিন (আর নাদার)	২০০০	২.৭	০	

ইলেক্টোরাল কলেজে রাজ্যগুলোর ভোট সংখ্যা

আলাবামা -- ৯

আলাস্কা -- ৩

অ্যারিজোনা -- ১০

আরকানস' -- ৬

ক্যালিফোর্নিয়া -- ৫৫

কলারাডো -- ৯

কানেকটিকাট -- ৭

ডেলাওয়ার -- ৩

ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া -- ৩

ফ্লোরিডা -- ২৭

জর্জিয়া -- ১৫

হাওয়াই -- ৪

আইডাহো -- ৪

ইলিনয় -- ২১

ইন্ডিয়ানা -- ১১

আইওয়া -- ৭

ক্যানসাস -- ৬

কেনটাকি -- ৮

লুইজিয়ানা -- ৯

মেইন -- ৪

মেরিল্যান্ড -- ১০

ম্যাসাচুসেট্স -- ১২

মিশিগান -- ১৭

মিনেসোটা -- ১০

মিসিসিপি -- ৬

মির্জৌরি -- ১

মন্টানা -- ৩

নেব্রাস্কা -- ৫

নেভাদা -- ৫

নিউ হ্যাম্পশায়ার -- ৪

নিউ জার্সি -- ১৫

নিউ মেক্সিকো -- ৫

নিউ ইয়র্ক -- ৩১

নর্থ ক্যারোলাইনা -- ১৫

নর্থ ডাকোটা -- ৩

ওহাইও -- ২০

ওকলাহোমা -- ৭

অরিগন -- ৭

পেনসিলভানিয়া -- ২১

রোড আইল্যান্ড -- ৪

সাইথ ক্যারোলাইনা -- ৮

সাউথ ডাকোটা -- ৩

টেনেসি -- ১১

টেক্সাস -- ৩৪

ইউটাহ -- ৫

ভারমন্ট -- ৩

ভার্জিনিয়া -- ১৩

ওয়াশিংটন -- ১১

ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া -- ৫

উইসকনসিন -- ১০

ওয়াইওমিঙ -- ৩

মোট -- ৫৩৮

==========

**Election 2004* পুস্তিকা থেকে অনূদিত।

জিআর/ ১৪ই অক্টোবর, ২০০৪

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন ২০০৪

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন পদ্ধতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে যারা ওয়াকেফহাল নয়, তাদের জন্য আমেরিকান নির্বাচন প্রক্রিয়ার একটি প্রারম্ভিক পর্যালোচনা হলো এই প্রকাশনা। "ইউএস ইলেকশনস ২০০৪" পুস্তিকাটির জন্য আমরা সাতজন বিশেষজ্ঞকে, যাদের অধিকাংশই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, তাদেরকে আন্তর্জাতিক পাঠকদের কাছে আসন্ন নির্বাচনের বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ দিক ব্যাখ্যা করতে বলেছি। আন্তর্জাতিক পাঠকদের অনেকেরই হয়তো সরকার নির্বাচনের ভিন্নতর পদ্ধতি থাকতে পারে।

জন এফ বিব্বি তার নিবন্ধে আলোচনা করেছেন আমেরিকান ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা। ১৭৮৯ সালে যখন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচিত হয়, তখন তাতে রাজনৈতিক দলগুলোর কথা স্থান পায়নি। কিন্তু ১৮০০-এর দশকের গোড়া থেকেই রাজনৈতিক দলগুলোর সূচনা এবং কালক্রমে এই রাজনৈতিক দলগুলো আমেরিকান গণতন্ত্রের একটি বুনিয়াদি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে দুটি দল যে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে, তার ওপরই আমেরিকান সরকার ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নির্ভর করছে।

স্টিফেন জে ওয়ান ব্যাখ্যা করেছেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দীর্ঘ প্রচারণা, বিশেষকরে মনোনয়ন প্রক্রিয়া। দলের প্রার্থী মনোনয়নের কনভেনশন ও প্রাইমারি নির্বাচন, যা আমেরিকান ব্যবস্থার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য,তাও সংবিধানে লিপিবদ্ধ ছিলনা। কালের বিবর্তনে গড়ে ওঠা এই সব বৈশিষ্ট্যের শিকড় প্রোথিত ছিল আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের প্রথম দিককার বছরগুলোতেই। এর পর মাইকেল ডাব্লিউ ট্রাগোট সবিস্তারে আলোচনা করেছেন নিবাচনী প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করে এবং কিভাবে ভোটাররা তাদের নাম রেজিস্ট্রি করে, কিভাবে ভোট গণনা করা হয় এবং ব্যালটের নকশা কিভাবে করা হয়।

ব্রুকিংস ইনস্টিটিউটের বিশিষ্ট রাজনৈতিক সমীক্ষক টমাস মানের সংগে আমাদের সাক্ষাৎকারে তিনি আলোচনা করেছেন আসন্ন নির্বাচন নিয়ে। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নির্বাচনের প্রথম ককাস অনুষ্ঠিত হওয়ার (জানু

য়ারি, ২০০৪) কয়েক মাস অনুষ্ঠিত এই সাক্ষাৎকারে তিনি আসন্ন নির্বাচন প্রক্রিয়া গতিধারার কোন কোন বিষয়ের ওপর নজর রাখতে হবে, তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। জন এইচ অলড্রিচ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ২০০৪ সালে কেবল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হবে না। একই সাথে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসনের সবকটিতেই এবং সিনেটের একশ'টির মধ্যে এক তৃতীয়াংশ আসনের। যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নর, মেয়র, রাজ্য বিধান সভার নির্বাচন হবে একই সাথে। নির্বাচনের আরো একটি আগ্রহোদ্দীপক দিক হলো এই আমেরিকান ব্যবস্থায় কোন একটি দল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে হোয়াইট হাউসের দখল পেতে পারে এবং অন্য একটি দল নিয়ন্ত্রণ পেতে পারে কংগ্রেসের কোন একটি পরিষদের বা দুটিরই।

সবশেষে আমরা আলোচনা করছি আধুনিক নির্বাচনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক জনমত সমীক্ষা এবং নির্বাচনী প্রচারণায় অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত আইন নিয়ে। জনমত সমীক্ষক জন জগবি বলছেন যে ভোটারদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে জনমত সমীক্ষা নির্বাচন প্রার্থীদের জন্য খুবই কাজে আসে। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়ার ক্ষেত্রে এই সমীক্ষা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে বা এর ভুল ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকে। যোশেফ ই ক্যান্টর যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে প্রার্থীদের চাঁদা দেয়া ও তাদের নির্বাচনী ব্যয় সম্পর্কে জটিল আইনগুলোর এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। ২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ব্যয় হয়েছিল ৬০ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার। নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত বিধিগুলো আমেরিকার দুটি মৌলিক মূল্যবোধের মধ্যকার সংঘাতের সংগে সংশ্লিষ্ট বলে অনুমান করা হয়। দুটি মৌলিক মূল্যবোধ হলো বাক স্বাধীনতা, যা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং সকল প্রার্থীর জন্য ন্যায়সঙ্গত ও সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা।

আমাদের কয়েকজন লেখক যেমন বলেছেন যে কয়েক শতাব্দীর মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা আমেরিকান নির্বাচন ব্যবস্থার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হলো এর স্থিতিশীলতা, যা আধুনিকাতা ও পরিবর্তনের চাহিদাগুলোর প্রতিও সংবেদনশীল। আগামী মাসগুলোতে ২০০৪ সালের নির্বাচনের বিভিন্ন ঘটনা যখন ঘটতে থাকবে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের পাঠকদের জন্য নির্বাচনের ঐতিহাসিক পটভূমি এবং বর্তমান নির্বাচনী প্রচারণার অনন্য দিকগুলো অনুধাবনে এই পুস্তিকাটি একটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে বলে আমরা আশা করছি।

==========

**Election 2004* পুস্তিকা থেকে অনূদিত।

জিআর/ ১৪ই অক্টোবর, ২০০৪

দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন ও আমেরিকার গণতন্ত্র

স্টিফেন জে ওয়েন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের ব্যবস্থাকে জটিল ও গোলমেলে মনে হয় এবং আসলেই এই প্রক্রিয়া সেরকমই। ১৯৭০ এর দশক থেকে ডেমোক্র্যাটিক ও রিবাপলিকান পার্টি প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে তাদের প্রার্থী মনোনয়নের পদ্ধতিতে সংস্কার শুরু করলেও পরিবর্তনগুলো এখনো স্থিতি লাভ করে নি। নতুন পদ্ধতিতে তিনিই সফল হবেন যিনি প্রার্থী মনোনয়নের এই জটিল প্রক্রিয়াকে ভালোভাবে বুঝে পরিকল্পিতভাবে তা কাজে লাগাতে পারবেন। আসলে সৃজনশীল রাজনীতিবিদরা প্রথমে রাজনীতির কূটকৌশলকে বোঝার চেষ্টা করেন এবং পরে সেটা দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করেন।

রাজনৈতিক দলসমূহ এবং তাদের প্রার্থী মনোনয়নের ঐতিহাসিক পটভূমি:

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ইলেকট্রকাল পদ্ধতির বিধান যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে উল্লেখ থাকলেও, প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়টি সংবিধানে স্পষ্ট করে লেখা নেই। ১৭০০ সালের শেষের দিকে যখন এই সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত ও অনুমোদন করা হয় তখন কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা হয়নি। সরকার তার কার্যক্রম শুরু করার পর এবং আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ধারাবাহিকতায় রাজনৈতিক দলগুলো ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে।

১৭৯৬ সালে সেময়ের একটি রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের জন্য অনানুষ্ঠানিকভাবে এক বৈঠকে মিলিত হন। "কিং ককাস" নামে পরিচিত প্রার্থী মনোনয়নের এই প্রক্রিয়া প্রায় ৩০ বছর ধরে চলে। ১৮২৪ সালে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে যখন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হতে শুরু করে এবং সেইসাথে পশ্চিম দিকে যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন সম্প্রসারণ হয় তখন প্রার্থী মনোনয়নের এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

কিং ককাসের পরিবর্তে ন্যাশনাল নমিনেটিং কনভেনশন আয়োজনের প্রচলন ঘটে। এন্টি ম্যাসনস (অহঃর-গধংড়হং) নামের ছোট একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ১৮৩১ সালে তাদের প্রার্থী নির্বাচন এবং দলের যে প্লাটফর্মের (একটি রাজনৈতিক দল বা একজন প্রার্থী কর্তৃক গৃহীত তার বা তাদের মুল আদর্শ ও নীতিমালা সম্পর্কিত ঘোষণা) উপর ভিত্তি করে তারা নির্বাচনে লড়বেন তা নির্দিষ্ট করার জন্য মেরিল্যান্ডের বাল্টিমোর শহরের একটি সভাকক্ষে মিলিত হন। পরবর্তী বছরে ডেমোক্র্যাট দলের প্রতিনিধিরা তাদের প্রার্থী মনোনয়নের জন্য ঐ একই সভাকক্ষে বৈঠক করেন। তখন থেকেই বড় দুটি দলসহ অধিকাংশ ছোট রাজনৈতিক দলও প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে দলীয় প্রার্থী নির্বাচন করার জন্য বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ন্যাশনাল নমিনেটিং কনভেনশন আয়োজন করতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর পুরোটা থেকে বিশ শতক পর্যন্ত রাজ্য পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ নমিনেটিং কনভেনশনগুলো নিয়ন্ত্রণ করতেন। নিজ নিজ রাজ্যের প্রতিনিধি বাছাই করার ক্ষেত্রে ও তারা যাতে কনভেনশনে ''সঠিকভাবে'' ভোট দেন তা নিশ্চিত করতে রাজ্য নেতৃবৃন্দ তাদের প্রভাব বিস্তার করতেন। দলের নেতৃপর্যায়ের ব্যক্তিদের এই কতৃর্ত্বের বিষয়টি এক পর্যায়ে দলের অভ্যন্তরে আলোচিত হতে থাকে। দলের প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যারা উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপের বিষয়টি পছন্দ করতেন না তারা নমিনেশন পদ্ধতি সংস্কারের প্রস্তাব দেন। এই সংস্কারের ধারাতেই সাধারণ নির্বাচনের আগে ''প্রাইমারীতে" ভোট দেয়ার জন্য দলের ভিতর থেকে প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রচলন শুরু হয়। ১৯১৬ সালের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী রাজ্যে প্রাইমারী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

অবশ্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় দলীয় সমর্থক ব্যক্তিদের অর্ন্তভুক্ত করার আন্দোলন খুব বেশীদিন টিকে থাকে নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যাঁরা প্রাইমারী ব্যবস্থাকে তাদের ক্ষমতার প্রতি একটি হুমকি হিসেবে বিবেচনা করতে থাকেন তারা রাজ্য পর্যায়ের আইন প্রণেতাদেরকে এই ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করেন এই যুক্তিতে যে প্রাইমারী আয়োজন বেশ ব্যয়সাধ্য এবং অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক মানুষ এতে অংশ নিচ্ছে। সম্ভাব্য কিছু প্রার্থীও প্রাইমারীতে অংশ নিতে অস্বীকার করেন, কেননা তারা রাজ্য পর্যায়ের দলীয় নেতৃর্ত্বের সমর্থন আগে থেকেই পেয়েছেন এবং জনপ্রিয় ভোটে অংশ নিয়ে সেই সমর্থন হারানোর ঝুঁকি নিতে চাননি। অন্যদিকে কিছু কিছু রাজ্যে দলীয় প্রার্থী নির্বাচনের এই ভোটের ব্যবস্থা ছিল অনেকটা পরামর্শকের মত। আর দলীয় কনভেনশনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা হত অন্য উপায়ে। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত মাত্র ১২টি রাজ্যে প্রেসিডেন্সিয়াল প্রাইমারী ব্যবস্থা চালু থাকে।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের প্রেক্ষিতে দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য আবার চাপ আসতে থাকে। প্রচার মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনের আবিষ্কার এ পর্যায়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। টেলিভিশনের কল্যাণে জনগণ নিজের ঘরে বসেই রাজনৈতিক প্রচারণা পর্যবেক্ষণের সুযোগ পায়। প্রার্থীরাও টেলিভিশনের এই প্রযুক্তিগত শক্তিকে তাদের বিপুল জনপ্রিয়তা এবং নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাকে প্রচার করবার কাজে ব্যবহারের সুযোগ পায়। ডোয়াইট আইজেনহাওয়ার, জন কেনেডি এবং রিচার্ড নিক্সনের মত প্রার্থীরা প্রচুর অর্থ ব্যয় ও বিপুল প্রচেষ্টায় বিভিন্ন রাজ্যের প্রাইমারীতে অংশ নিয়ে এটা প্রমাণ করেন যে সামরিক বাহিনীর একজন জেনারেল, ক্যাথলিক অনুসারী একজন ব্যক্তি এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একবার পরাজিত প্রার্থী সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হতে পারেন। তাঁরা এক্ষেত্রে সফলও হয়েছিলেন। তাদের প্রত্যেকেই পর্যায়ক্রমে দলীয় মনোনয়ন পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

উপরন্তু ১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি শুরু হয়ে ১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত চলা ভিয়েতনাম যুদ্ধ ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের জন্ম দেয়। এর ফলে নির্বাচন পদ্ধতিতে আরো সংস্কারের জন্য চাপ আসতে থাকে। ১৯৬৮ সালে ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী নির্বাচনের সময় এই চাপ আরো বৃদ্ধি পায়। ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন দলের অভ্যন্তরে ভাঙ্গনের সূচনা করে আর এর ফলশ্রুতিতে শিকাগো শহরের রাস্তায় সংঘাতপূর্ণ বিক্ষোভ হয়। সেবার এই শহরেই ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভা চলাকালে বিক্ষোভ সত্ত্বেও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে হিউবার্ট হামফ্রেকে মনোনীত করা হয়। হামফ্রে ডেমোক্র্যাটিক দলের কোন প্রাইমারীতে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানানোয় তিনি যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভকারীদের সমালোচনার মুখে পড়েন।

হিউবার্ট হামফ্রেকে মনোনয়ন দেয়ার ফলে দলে যে বিভক্তি দেখা দেয় তা মেটানোর লক্ষ্যে ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশনে দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনয়নের প্রক্রিয়া পুনর্নিরীক্ষা করার জন্য একটি কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ডেমোক্রেটিক দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে দলের অংশগ্রহণ আরো বাড়ানো এবং নমিনেটিং কনভেনশনে দলের প্রতিনিধিত্বকে আরো ন্যায়সঙ্গত করার লক্ষ্যেই এই কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির গৃহীত সংস্কারের ফলেই বড় দুই দলেই প্রেসিডেন্সিয়াল প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় আরো বেশী গণতান্ত্রিক চর্চা সূচীত হয়।

বর্তমানে প্রচলিত প্রাইমারী ও ককাস পদ্ধতি

ডেমোক্রেটরা যে বড় ধরনের সংস্কারের সূচনা করেন তাতে অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যই প্রাইমারী আয়োজন করতে উৎসাহী হয়। রাজ্য কর্তৃপক্ষই তাদের বাসিন্দাদের জন্য নির্বাচনী আইন প্রণয়ন করে থাকে।

বর্তমানে প্রচলিত বিধান অনুযায়ী প্রাইমারী হচ্ছে প্রেসিডেন্ট পদে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের জন্য নিজ দলের সমর্থকদের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করা। সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের নির্বাচনী আইন অনুয়ায়ী ভোটাররা একটি দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে আগ্রহী ব্যক্তিকে সরাসরি ভোট দিয়ে মনোনীত করতে পারেন অথবা আগ্রহী প্রার্থীদের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কনভেনশন ডেলিগেটদের পরোক্ষভাবে নির্বাচন করে থাকেন।

প্রচলিত পদ্ধতিতে কেবল আরেকটি উপায় রয়েছে সেটা হলো কয়েক ধাপে ককাস/কনভেনশনের আয়োজন করা। অপেক্ষাকৃত ছোট একটি ভৌগলিক এলাকা বা স্থানীয় মহল্লায় বসবাসরত দলীয় সমর্থকরা একটি নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো হয়ে নিজেদের ডেলিগেট বা প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট দেয়। এই ডেলিগেটরা নির্দিষ্ট প্রার্থীকে সমর্থন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকেন। মহল্লার এই ডেলিগেটরা পরবর্তীতে কাউন্টি কনভেনশনে তাদের এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন। এই কাউন্টি কনভেনশনেই অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কনভেনশনের ডেলিগেট নির্বাচন করা হয়ে থাকে। আর রাজ্য কনভেনশনের ডেলিগেটরা জাতীয় কনভেনশনে নিজ নিজ অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিভিন্ন স্তরে এইসব কনভেনশন আয়োজন করতে বেশ কয়েক মাস সময় লাগে, কিন্তু প্রথম পর্যায়ের ভোটেই প্রার্থীতা পছন্দের বিষয়টি নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জাতীয় পর্যায়ের নমিনেটিং কনভেনশনে এক একটি রাজ্যের কতজন প্রতিনিধি অংশ নেবেন তা নির্ধারিত হয় ঐ দল কর্তৃক নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। কয়েকটি বিষয় যেমন রাজ্যের মোট জনসংখ্যা, জাতীয় পর্যায়ে দলের প্রার্থীদের প্রতি ঐ রাজ্যের জনগণের অতীত সমর্থন এবং সরকারের বিভিন্ন পদে কর্মরত নির্বাচিত প্রতিনিধি বা দলীয় নেতৃবৃন্দের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে জাতীয় কনভেনশনে বিভিন রাজ্যের ডেলিগেটদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ডেমোক্র্যাটরা যে পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ডেলিগেট নির্বাচন করে থাকে তাতে দেখা যায় রিপাবলিকান দলের জাতীয় কনভেনশনের যে সংখ্যক ডেলিগেট অংশ নিয়ে থাকেন তার চেয়ে দ্বিগুণ সংখ্যক ডেলিগেট ডেমোক্র্যাট কনভেনশনে অংশ নিয়ে থাকেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে কংগ্রেস কর্তৃক নির্ধারিত বিধিমালার আলোকে বিভিন্ন রাজ্যকে নিজ নিজ নির্বাচনী আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যদিও রাজ্য কর্তৃপক্ষ নিজেরাই প্রাইমারী ও ককাস নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করতে পারে তবুও তারা রাজনৈতিক দলের বিধিমালার আওতার মধ্যেই প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া পরিচালনার তাগিদ অনুভব করে। এর কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট এটা নির্দিষ্ট করেছে যে জাতীয় কনভেনশনে রাজনৈতিক দলগুলো ডেলিগেটদের মাঝে তাদের নিজেদের বিভিন্ন বিধিমালা বর্ণনা ও প্রয়োগ করার অধিকার রয়েছে। এর ফলে কোন রাজ্যে রাজনৈতিক দলের নিজস্ব বিধিমালার বাইরে দলের

কনভেনশনে ডেলিগেট নির্বাচনের অনুমতি দেয়া হলে জাতীয় পর্যায়ে দলের কনভেনশনে ঐসব ডেলিগেটদের চ্যালেঞ্জ করা হতে পারে অথবা দলের নীতিমালা ভঙ্গ করার দায়ে জাতীয় করভেনশনে ডেলিগেটদের সংখ্যা হ্রাস করা হতে পারে।

বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর জাতীয় কনভেনশনে যেসব ডেলিগেটরা অংশ নিয়ে থাকেন তাদের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী প্রাইমারীর মাধ্যমে নির্বাচিত হন যেখানে ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকান দলের রেজিস্ট্রার্ড অথবা স্ব-ঘোষিত সদস্যরা অংশ নিতে পারেন।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টি তার অধিভুক্ত সকল রাজ্য সংগঠনের জন্য একটি জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, কিন্তু রিপাবলিকান পার্টি তেমনটি করেনি। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নীতিমালা অনুযায়ী যে বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সে বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম মঙ্গলবার থেকে জুন মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবারের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনয়নের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে আইওয়া ও নিউ হ্যাম্পশায়ারে এর আগেই নির্বাচন হয়ে থাকে কেননা এই দুটি রাজ্যেই প্রথম ককাস ও প্রাইমারী অনুষ্ঠানের দীর্ঘদিনের প্রচলন রয়েছে। বিভিন্ন কম্যুনিটির মধ্যে সংখ্যালঘু নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য ডেমোক্র্যাট দলের রাজ্য পর্যায়ের ডেলিগেটদের মধ্যে কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ প্রতিনিধি কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টের চেয়ে বড় নয় এমন ডিস্ট্রিক্ট থেকে নির্বাচনের বিধান রাখা হয়েছে। উপরন্তু একজন নির্দিষ্ট প্রার্থীকে সমর্থন করতে যেসব ডেলিগেট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন তাদের সংখ্যা নির্ধারিত হয় ডেলিগেট বা তাদের সমর্থিত প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যার অনুপাতে। ডেমোক্র্যাট দলে নির্বাচিত এসব প্রতিনিধি ছাড়াও দলের নেতৃবৃন্দ ও নির্বাচিত কর্মকর্তাদের মাঝ থেকেও ডেলিগেট নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তবে এসব ডেলিগেট কোন নির্দিষ্ট প্রার্থীকে সমর্থন দিতে বাধ্য নন। এমনকি কোন প্রার্থী তার রাজ্যে প্রাইমারী নির্বাচনে বিজয়ী হলেও এসব ডেলিগেট তাকে সমর্থন নাও দিতে পারেন। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির রীতি অনুযায়ী রাজ্য পর্যায়ের ডেলিগেটদের সংখ্যা নারী ও পুরুষদের মধ্যে সমানভাবে বিভাজিত হতে হবে।

দুটো রাজনৈতিক দলের নীতিমালার মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্বেও দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেরিয়ে এসেছে। এই দুটো দিক হলো:

- নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুরুর দিকেই অধিকাংশ অঙ্গারাজ্য প্রাইমারী ও ককাস আয়োজনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। দলীয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রভাব বিস্তার, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিভিন্ন নাগরিক প্রয়োজন ও স্বার্থের বিষয়গুলো যাতে প্রার্থীরা তুলে ধরে এবং প্রচারণার অর্থ যেন

তাদের পিছনেও খরচ করা হয় সে জন্যই রাজ্যগুলো প্রাইমারী আয়োজনে উৎসাহী হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থা এখন ''ফ্রন্টলোডিং'' নামে পরিচিত।

- ''রিজিওনালাইজেশন'' নামে পরিচিত প্রচলিত রীতিতে বিভিন্ন রাজ্য কর্তৃপক্ষ একই দিনে প্রাইমারী ও ককাস আয়োজনের জন্য একে অন্যকে সহযোগিতা করে থাকে। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রভাব বাড়ানোর জন্যই এটা করা হয়ে থাকে।

এই দুই কারণে প্রার্থীরা রাজ্য পর্যায়ে অবস্থান পাকাপোক্ত করতে বেশ আগে থেকেই প্রচার কার্যক্রম শুরু করতে বাধ্য হচ্ছে কেননা এখানেই প্রাথমিক পর্যায়ে আগ্রহী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। গণমাধ্যম বিশেষ করে রেডিও ও টেলিভিশনের উপর এবং রাজ্য পর্যায়ের দলীয় নেতৃবৃন্দের উপরও প্রার্থীদের নির্ভরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই দিনে অনেকগুলো রাজ্যে প্রাইমারী অনুষ্ঠিত হলে ভোটারদের কাছে নিজেদের প্রার্থীতার বিষয়টি উপস্থাপনের জন্যই এই নির্ভরতা।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রাইমারী অনুষ্ঠানের সময় ফ্রন্টলোডিং এবং রিজিওনালাইজেশন প্রক্রিয়ায় জাতীয়ভাবে পরিচিত প্রার্থীরা লাভবান হচ্ছে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট, বড় বড় রাজ্যগুলোর গভর্নর এবং যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যবৃন্দ যাঁদের রয়েছে প্রচুর অর্থ ও মিডিয়া এবং সাংগঠনিক সমর্থন।

উদাহরণ হিসাবে ২০০৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাইমারী নির্বাচনের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। সর্বপ্রথম যে রাজ্যে প্রাইমারী বা ককাস নির্বাচন অনুষ্ঠান হওয়ার তারিখ নির্ধারিত ছিলো তার ১০ মাসেরও বেশী সময় আগে ২০০৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ডেমোক্র্যাটিক পার্টির আটজন সম্ভাব্য প্রার্থী ২৫ মিলিয়ন ডলার নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহ করে ৭ মিলিয়ন ডলার ঐ সময়ের মধ্যেই খরচ করে। এসব প্রার্থীদের মধ্যে যারা কংগ্রেসের সদস্য তারা সবচেয়ে বেশী অর্থ সংগ্রহ করেন। আর সবচেয়ে বেশী মানুষের কাছে পরিচিত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ বা পলিটিক্যাল কনসালট্যান্ট নিয়োগ ও প্রচারণার জন্য সবচেয়ে বৃহৎ সংগঠন গড়ে তোলার কাজেও তারা এগিয়ে থাকেন। দলীয় মনোনয়ন প্রক্রিয়ার অংশ নেয়ার জন্য যেসব প্রার্থীকে প্রাইমারী ও ককাস নির্বাচনে অংশ নিতে হয় তাদের ক্ষেত্রে এই নির্বাচনের সীমিত সময়সীমা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৬ সালে জিমি কার্টার এবং ২০০০ সালে জন ম্যাককেইনকে এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তন সূচীত হচ্ছে তা সকল প্রার্থীকেই প্রভাবিত করছে। এমনকি ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টও যে পরবর্তী নির্বাচনের জন্য তার নিজের দল থেকে মনোনয়ন

পাবেন তা নিশ্চিত নয়। রক্ষণশীল কিছু টক শো উপস্থাপক ও সংবাদপত্রের একজন কলামিস্ট প্যাট বুকাননের কারণে ১৯৯২ সালে জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রাইমারী নির্বাচনে বিব্রতকর পরাজয়ের মুখোমুখি হন। অন্যদিকে ১৯৯৬ সালে বিল ক্লিনটন তাঁর নিজ দলের মাঝ থেকেই যারা তার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তাদেরকে নিরুৎসাহিত করার জন্য শুরুর দিকেই অনেক অর্থ সংগ্রহ করেন। ক্লিনটন এই অর্থ দিয়ে প্রাইমারী ও ককাস নির্বাচনের শুরু থেকে জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর কৌশল গ্রহণ করেন।

আইওয়া ককাস: কাউন্টি পর্যায়ে প্রথম রাউন্ডের ককাস অনুষ্ঠানের পদ্ধতি

ডেমোক্র্যাটস: কেবল ডেমোক্র্যাট দলের রেজিস্টার্ড সদস্য যারা ঐ নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করে এবং ভোট দেয়ার যোগ্য তারা এই রাউন্ডে অংশ নিতে পারেন। এই পর্যায়ের ককাসে অংশগ্রহণকারীদেরকে পছন্দসই প্রার্থীদের পক্ষে বিভিন্ন গ্রুপে যোগ দেয়ার জন্য বলা হয়। উপস্থিত দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ১৫ শতাংশ সদস্য একটি গ্রুপ বা দলে ভাগ হতে পারেন যাতে করে ঐসব গ্রুপগুলো শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। ১৫ শতাংশের কম সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়, তবে এসব গ্রুপের সদস্যরা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে সক্ষম গ্রুপগুলোতে নিজেদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। সভার এই পর্যায়ে নানামুখী লবিং হতে থাকে। ককাসে উপস্থিত গ্রুপগুলো কতজন ভোটারের প্রতিনিধিত্ব করছে তার অনুপাতেই এসব গ্রুপ একজন প্রার্থীর পক্ষে ডেলিগেট বা প্রতিনিধির সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

রিপাবলিকানস: ককাসে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে কেউ যদি রিপাবলিকান পার্টির রেজিস্টার্ড সদস্য না হলেও তিনি যদি ভোট দেয়ার যোগ্য হন তাহলে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে তিনি প্রেসিডেন্ট পদে তার পছন্দসই প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিতে পারেন। এসব ভোট অঙ্গরাজ্য ভিত্তিক গণনা করা হয়ে থাকে। কাউন্টি কনভেনশনের জন্য ডেলিগেট নির্বাচনের বিষয়টি ককাস যেভাবে সিদ্ধান্ত নেয় তার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে হয় সরাসরি ভোট অথবা রাজনৈতিক ধারা উপলব্ধির জন্য আয়োজিত অনানুষ্ঠানিক ভোটের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে ডেলিগেট নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

প্রার্থী মনোনয়ন ও গণতান্ত্রিক চর্চা:

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় সংস্কারের ফলে স্পষ্টতঃই জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তি সম্প্রসারিত হয়েছে। মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় সাম্প্রতিক পরিবর্তনের আগে ১৯৬৮ সালে ভোট দেয়ার যোগ্য জনগোষ্ঠীর আনুমানিক ১১ শতাংশ অর্থাৎ মাত্র ১২ মিলিয়ন ব্যক্তি প্রাইমারীতে ভোট দেন। ২০০০ সালে আনুমানিক ৩৫ মিলিয়ন ব্যক্তি প্রাইমারীতে অংশ নেন যা ছিল দেশের মোট বৈধ নির্বাচকমন্ডলীর ১৫

শতাংশ। ২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং রিপাবলিকান পার্টির অভ্যন্তরে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে প্রাইমারী নির্বাচনে ২০ মিলিয়নেরও বেশী ভোটার অংশ নেন। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে ভাইস-প্রেসিডেন্ট আল গোর ও তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ প্রাক্তন সিনেটর বিল ব্র্যাডলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রায় ১৫ মিলিয়ন ভোটার প্রাইমারীতে অংশ নেন।

জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ছাড়াও, প্রেসিডেন্ট পদে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের আধুনিক প্রক্রিয়ায় প্রতিটি দলে মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রার্থীকে ঘিরে যে জোট গঠিত হয় তাদের প্রতিনিধিত্বও বাড়ছে। যদিও নমিনেটিং কনভেনশনে বিভিন্ন দলের ডেলিগেটদের মধ্যে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও জেন্ডারের মাঝ থেকে ডেলিগেট নির্বাচনের প্রবণতা বেড়েছে, সেই অর্থে আদর্শিক প্রতিনিধিত্ব বাড়েনি। এর কারণ হচ্ছে প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় কর্মীরাই অধিক হারে অংশ নিচ্ছে যাদের মধ্যে দলীয় আদর্শের বিষয়টি সাধারণ সমর্থকদের চেয়ে অনেক বেশী মাত্রায় কাজ করে। আর সেকারণেই মনে করা হয় রিপাবলিকান কনভেনশনে যেসব ডেলিগেট অংশ নেন তারা নিজ দলের নির্বাচকমন্ডলীর চেয়ে অনেক বেশী রক্ষণশীল এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডেলিগেটরা তাদের দলের ভোটারদের চেয়ে অনেক বেশী উদার।

আগেই যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় এসব সংস্কারের ফলে রাজ্য পর্যায়ের দলীয় নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা অনেকখানি খর্ব হয়েছে এবং মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রার্থীরা ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করে এমন কর্মসূচী নিতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এর ফলে প্রার্থী এবং তাদের সমর্থকদের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি আরো জোরালো হচ্ছে এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থী তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে উৎসাহিত হচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ দায়িত্ব নেয়ার পর প্রথম বছরেই নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি যেসব নীতি ও লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন তা বাস্তবায়ন করার জন্য উদ্যোগ নেন। এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে কর অবলোপন, শিক্ষাখাতের সংস্কার, সামরিক প্রস্তুতি বাড়ানো এবং তাঁর রক্ষণশীল রাজনৈতিক ভিত্তির অনুকূলে নীতি নির্ধারণ করা।

যদিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের ফলে প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রায়ন ঘটেছে, তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসঙ্গতি রয়েই গেছে। যারা প্রাইমারী নির্বাচনে অংশ নিয়ে থাকেন তারা সাধারনতঃ অধিক শিক্ষিত, তাদের আয়ও অন্যদের চেয়ে বেশী এবং রিপাইলকান ও ডেমোক্রেট ভোটারদের গড় বয়সের চেয়ে তাদের বয়সও অপেক্ষাকৃত বেশী। এছাড়াও যারা প্রার্থীদেরকে অর্থ দিয়ে অথবা তাদের প্রচারণায় সাহায্য করে থাকেন তারা সব সময়ই আর্থসামাজিক বিবেচনায় উপরের দিকে অবস্থান করেন। আর এর ফলে অনিবার্যভাবেই নির্বাচনী ফলাফল নির্ধারণে তারা জোরালো প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

সবশেষে বলা যায়, জনসমক্ষে এবং বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে এমন প্রক্রিয়ায় প্রার্থী মনোনয়নের ফলে বিভিন্ন দলের অভ্যন্তরে উপদলের সৃষ্টি হয়। প্রত্যাশিত প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যত বেশী হবে দলের মধ্যে এই ভাগ তত বৃদ্ধি পাবে। নিজ দল মনোনীত প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর জন্য সফল প্রচারণা চালাতে হলে অবশ্যই যত দ্রুত সম্ভব অভ্যন্তরীণ বিভাজন দুর করতে হবে।

রাজনৈতিক দলের কনভেনশনের প্রভাব:

প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের ফলে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দলের যে নমিনেটিং কনভেনশন হয় তার গুরুত্ব অনেকখানি কমে আসছে। এখন তুলনামুলকভাবে মনোনয়ন প্রক্রিয়ার বেশ আগের দিকেই ভোটারদের দ্বারাই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী নির্দিষ্ট হয়ে থাকেন। আর ঐ প্রার্থী কনভেনশনের আগে আগে তাঁর পছন্দের ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর নাম ইঙ্গিত করেন। এছাড়া বিজয়ী প্রার্থী তাঁর দলের কর্মসূচী প্রণয়নের বিষয়টিও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তাহলে কেন আমেরিকার জনগণ টেলিভিশনে এসব নমিনেটিং কনভেনশন দেখার জন্য সময় ব্যয় করবে?

আর এখনকার বাস্তবতা হচ্ছে অনেক নাগরিকই টেলিভিশনে এসব কনভেনশন দেখে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টেলিভিশনে নমিনেটিং কনভেনশন দেখার হার অনেক কমে গেছে। সেইসাথে বড় বড় বিভিন্ন টেলিভিশন নেটওয়ার্ক তাদের প্রাইম টাইমে কনভেনশনের কার্যপ্রণালী বা বিভিন্ন দিক প্রচারের সময়ও কমিয়ে দিয়েছে। ২০০০ সালের গ্রীষ্মে যখন বড় দুই দল তাদের নমিনেটিং কনভেনশন আয়োজন করে তখন বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যে জরিপ চালায় তাতে দেখা গেছে টেলিভিশন দর্শকদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই দুই দলের কোনটির কনভেনশনের কার্যপ্রণালী দেখার জন্য টেলিভিশন খোলেনি।

টেলিভিশন দর্শকদের মাত্রা কমে গেলেও সংবাদধর্মী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং সংবাদপত্রে কনভেনশনের খবরাখবর এখনও বেশ গুরুত্ব পায়। ২০০০ সালে পরিচালিত ঐসব গবেষণায় এটাও দেখা যায় যে কনভেনশনের আগে ও পরে এ সম্পর্কে জনগণের সচেতনতার মাত্রা বেড়েছে। সেইসাথে প্রার্থীদের এবং তাদের বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পর্কেও জনগণের ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এর ফলে ভোটারদের বিভিন্ন বিষয় জানার ক্ষেত্রে, নিজ দলের প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন জোগাড় করা ও দলীয় কর্মীদের মাঝে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে এবং আসন্ন সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে সারা দেশের মানুষের আগ্রহ সৃষ্টিতে নমিনেটিং কনভেনশনগুলো ভূমিকা রাখে।

প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়নের প্রক্রিয়া অবশ্যই সবদিক থেকে যথার্থ নয়, তবে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে এই প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ বেড়েছে, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং

সাধারণ দলীয় সমর্থক ও প্রার্থীদের মধ্যে যোগাযো জোরালো হয়েছে। এর ফলে যেসব প্রার্থী তুলনামূলকভাবে বেশী পরিচিত তারা সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে বেশী অর্থ জোগাড় করতে পারেন, প্রচারণার জন্য সবচেয়ে কার্যকর সংস্থাকে নিয়োগ দিতে পারেন এবং প্রাইমারী নির্বাচনের মৌসুমের শুরুতেই ভোটারদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ জাগাতে সমর্থ হন।

==========

*_Election 2004_ পুস্তিকা থেকে অনূদিত।

জিআর/ ১৪ই অক্টোবর, ২০০৪

২০০৪ সালের নির্বাচনী প্রচারণা সম্পর্কে টমাস মানের সাক্ষাৎকার

পল মালামুদ

প্রশ্ন: ২০০৪ সালের নির্বাচনের প্রধান প্রধান ইস্যুগুলো কি?

উত্তর: প্রত্যেক নির্বাচনের প্রচারণার সময় বিভিন্ন ইস্যু উঠে আসে। কিন্তু ধারণা করা হচ্ছে আসন্ন নির্বাচনের আগে দুটো বিষয় প্রাধান্য পাবে। একটি হল অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন যার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, চাকুরির বাজার আর যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব সংক্রান্ত নীতিমালর সার্বিক অবস্থা।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল নিরাপত্তা। এর অর্থ হল অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদের পটভূমিতে আমেরিকানদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাবোধ। বিশেষ করে আফগানিস্থান ও ইরাকে আমাদের সামরিক হস্তক্ষেপের পর জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টিও এবারের প্রচারণায় অন্যতম একটি ইস্যু হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন: সাধারণ আমেরিকানরা কি পররাষ্ট্র নীতি সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায়?

উত্তর: আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে আমেরিকানদের চিন্তাভাবনার বিষয়টির তারতম্য ঘটে। আরো বিস্তৃত আকারে বললে স্নায়ুযুদ্ধ চলার সময় আমেরিকানরা তাদের পররাষ্ট্র নীতির বিষয়ে খুব গুরুত্ব দিত। সেই সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধ খুব স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকানদের কাছে একটি বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। আমি মনে করে ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার কারণে ২০০৪ সালের নির্বাচনে পররাষ্ট্র নীতির বিষয়টি বেশ গুরুত্ব পাবে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনের উপর সন্ত্রাসী হামলা আমেরিকানদের কাছে এটা স্পষ্ট করে দেয় যে আমরা নিজেদেরকে যতটা নিরাপদ ভাবতাম বাস্তব অবস্থা আসলে তার চেয়ে ভিন্ন। আর সে কারণেই প্রেসিডেন্ট বুশ যখন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পক্ষে যুক্তি দেখান তখন আমাদের জনগণের অধিকাংশই তা সমর্থন করেন।

১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর আমেরিকানরা এখন মনে করেন যে আমাদের পররাষ্ট্র নীতির সাথে দেশের নিরাপত্তার একটি স্পষ্ট যোগসূত্র রয়েছে। আমেরিকান জনগণের মাঝে প্রেসিডেন্টের জনপ্রিয়তা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি এবং তিনি দৃঢ় নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন প্রায় সবার মধ্যে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পিছনে বুশ প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ পদক্ষেপ নয়, বরং তার গৃহীত পররাষ্ট্র নীতিমালাই বড় ভূমিকা রেখেছে।

১১ই সেপ্টেম্বরের পর বিভিন্ন জনমত সমীক্ষায় জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে জনগণের বিশ্বস্ততা অর্জনের ক্ষেত্রে রিপাবলিকানরা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। জনমত জরিপে এই সুবিধাজনক অবস্থা বজায় রাখাই হবে প্রেসিডেন্ট বুশের পুন:নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে বড় একটি বিষয়। হোয়াইট হাউজে ফিরে আসার জন্য রিপাবলিকানদের এই সুবিধাজনক অবস্থানকে নামিয়ে আনাই হবে ডেমোক্রেটদের অন্যতম লক্ষ্য।

আফগানিস্তান ও ইরাকে সুস্পষ্ট সামরিক বিজয়ের পর যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ঐ দুই দেশে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যৌথ বাহিনীকে যে জটিল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তার ফলে বুশ প্রশাসনের সমালোচকরা এটিকে নির্বাচনী প্রচারণায় একটি ইস্যু করার সুযোগ পাচ্ছেন।

প্রশ্ন: এর আগে ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিস্টার বুশ ও মিস্টার গোরের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। বিগত নির্বাচনে দুই জন প্রার্থীর এই কাছাকাছি অবস্থান ২০০৪ সালের নির্বাচনী কৌশলে কি ধরনের প্রভাব ফেলবে?

উত্তর: ২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলের নিষ্পত্তি হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের ৫-৪ ভোটের এক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। সুপ্রিম কোর্টের ঐ সিদ্ধান্তে ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ভোট পুনর্গণনার বিষয়টি বাতিল করে দেয়া হয়। এখানে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল ২০০০ সালের নির্বাচনের ফলাফল এই বাস্তবতারই প্রতিফলন যে জাতি হিসেবে আমরা আধা-আধি বিভক্ত। নির্বাচিত সবগুলো প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে ভোটাররাও প্রায় সমানভাবে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের মাঝে বিভক্ত।

এর ফলশ্রুতিতে আমি মনে করি দুই দলের কৌশলেই ২০০৪ সালের নির্বাচনে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের বিষয়টি অনুমান করা হচ্ছে। দুই দলই উপলব্ধি করছে যে তাদের কট্টর সমর্থকদের ভোটে অংশ নেয়ার ব্যবস্থা করা কতটা জরুরী। আর তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে ভোটারদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তারা তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবে। আমার ধারণা টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের জন্য যে পরিমাণ অর্থ এতদিন খরচ করা হত সেই অর্থের একটি বড় অংশ এবার অন্য খাতে খরচ করা হবে। যদিও টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের জন্য এবার

যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ খরচ করা হবে, তবে ভোটারদের চিহ্নিতকরণ ও তাদেরকে ভোট দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে এবার নির্বাচনী প্রচারণার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের একটি চমকপ্রদ পালাবদল ঘটবে।

উভয় দল এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলি তাদের সমর্থকদেরকে ভোট কেন্দ্রে নেয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করবে। ২০০০ সালে ফ্লোরিডায় নির্বাচনী ফলাফলকে কেন্দ্র করে দলীয় সমর্থকদের মধ্যে যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল সেই অনুভূতিকে প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসেবে কাজে লাগিয়ে ডেমোক্র্যাটরা এবার তাদের ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নেয়ার জন্য চেষ্টা করবে।

এটাও অবশ্য মনে রাখতে হবে যে ২০০২ সালে কংগ্রেসে মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় ভোটারদেরকে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসার প্রতিযোগিতায় রিপাবলিকানরা জয়ী হয়েছিল। রিপাবলিকানরা তাদের সমর্থকদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে ডেমোক্র্যাটদের তুলনায় বেশী সফলতা দেখাতে পেরেছিল। আর মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের জয়ী হওয়ার পিছনে এই সাফল্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন: রাজনৈতিক দলগুলো ভোটারদেরকে ভোটকেন্দ্রে আনতে কি ধরনের উদ্যোগ নিয়ে থাকে?

উত্তর: অন্য যেসব দেশে ভোট দেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে অথবা ভোট দেয়ার হার অনেক বেশী, এই বিষয়টি সেসব দেশে একইভাবে উত্থাপিত হয় না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দেয়ার যোগ্য নাগরিকদের মধ্যে অন্তত ৫০ শতাংশের অংশ গ্রহণের প্রথা চালু থাকায় ভোটারদেরকে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে তৰ উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

এখন যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন কোন কোন বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে আমেরিকানরা সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা ভোট দিতে যাবে অথবা যাবে না, তাহলে সবচেয়ে আগে তথ্যপ্রাপ্তির বিষয়টি উঠে আসবে। সম্ভাব্য ভোটাররা কি আদৌ জানে যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে? তারা কি জানে যে কারা এই নির্বাচনের প্রার্থী? তারা কি এটাও জানে যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কি কি ধরনের পার্থক্য রয়েছে? দ্বিতীয়তঃ দুই দলের কোন একটির সাথে কি তাদের কোন ধরণের সম্পৃক্ততা রয়েছে? নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী শক্তিসমূহের সাথে তারা কোন না কোন ভাবে যুক্ত কি না?

তৃতীয়তঃ কেউ কি তাদেরকে ভোট দোর জন্য অনুরোধ করেছে? এমন কারো সাথে কি তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে যারা ভোট কেন্দ্রের অবস্থান এবং ভোট দেয়ার জন্য কখন সেখানে পৌঁছাতে হবে এমন তথ্য তাদেরকে জানিয়েছে? সর্বশেষ এই বিষয়টি ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়।

ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য যেসব উদ্যোগ নিতে হয় তার মধ্যে রয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলা, সম্ভাব্য সমর্থকদের চিহ্নিত করার জন্য কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণ করা,

টেলিফোন, সরাসরি চিঠি এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। আর এই ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে এমন কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে যিনি ভোটারদের কমিউনিটির একজন সদস্য এবং তাদের সাথে কাজ করেন। এরপর নির্বাচনের দিন সম্ভাব্য সমর্থকদেরকে আবার ফোন করে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ভোটকেন্দ্রে গিয়েছেন। কখনো কখনো ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য পরিবহণের ব্যবস্থাও করতে হবে। ভোটারদের আকৃষ্ট করতে এসব উদ্যোগ আসলেই অসাধারণ।

প্রশ্ন: স্বভাতই সংগঠিত করার বিষয়টি যেসব নির্বাচনী এলাকায় দলের ভিত্তি মজবুত সেখানে বেশী কাজ করে। কোন নির্বাচনী এলাকায় কোন রাজনৈতিক দলের ভিত্তি শক্তিশালী?

উত্তর: মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পলিটিক্যাল স্টাডিজের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের অবস্থানগত ভিত্তির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই বিশ্লেষণে দেখা যায় ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থকদের মধ্যে আফ্রিকান-আমেরিকানরাই সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। তাদের ১০ ভাগের ৯ ভাগই ডেমোক্র্যাটদের ভোট দিয়ে থাকে। হিসপ্যানিকরাও ডেমোক্র্যাটদেরই সমর্থন করে থাকে। তবে তাদের মাঝে সমর্থনের মাত্রা কিছুটা কম, প্রতি দুই জনে একজন। ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত পরিবারের ভোটাররাও ডেমোক্র্যাটদেরই ভোট দিয়ে থাকে। নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী ভোটারদের পছন্দও ডেমোক্র্যাটদের দিকে। যদিও তাদের মধ্যে সামাজিকভাবে কিছু রক্ষণশীল ব্যক্তি রয়েছে। আর এদের মধ্যে আবার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি রিপাবলিকান প্রার্থীদের ভোট দিয়ে থাকে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ভোটাররা রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক।

ভোটারদের মধ্যে যাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে এবং সিঙ্গেল প্যারেন্ট পরিবারগুলো সাধারণত ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকেই সমর্থন করে থাকে, অন্য দিকে বিবাহিত যুগলদের মাঝে রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক বেশী। ধর্মীয় সম্পৃক্ততা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন রিপাবলিকান পার্টির সমর্থনের একটি উল্লেখযোগ্য নিয়ামক। যে ব্যক্তি যতটা বেশী ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করেন তার ক্ষেত্রে রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক হওয়া ও রিপাবলিকান প্রার্থীকে ভোট দেয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ধর্মনিরপক্ষেরা সাধারণতঃ ডেমোক্র্যাট সমর্থক হয়ে থাকে।

উচ্চ আয়ের ব্যক্তিরা ঐতিহ্যগতভাবেই রিপাবলিকান। ছোট ব্যবসায়ী থেকে কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ অর্থাৎ যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে যুক্ত তাদের বেলায় এটা আরো বেশী মাত্রায় সত্যি। অন্যদিকে

পেশাজীবীরা অর্থাৎ যারা উচ্চ শিক্ষিত এবং স্নাতক ডিগ্রীধারী তারা অধিক হারে ডেমোক্র্যাটদের ভোট দিয়ে থাকে।

তাছাড়া প্রতিটি রাজনৈতিক দলের শক্তিশালী ভিত্তির ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পার্থক্যও রয়েছে। আমরা এটাকে ''লাল ও নীল রাজ্য" বলে থাকি। গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর টেলিভিশনে যুক্তরাষ্ট্রের মানচিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে দেশকে যেভাবে ভাগ করা হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করেই এটা উল্লেখ করা হয়। মানচিত্রের নীল রাজ্যগুলোতে ডেমোক্র্যাট ভোটারদের সংখ্যা বেশী। পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের এবং উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলোর বাসিন্দারা সাধারণত ডেমোক্র্যাটদের অধিক সংখ্যায় ভোট দিয়ে থাকে। লাল অর্থাৎ রিপাবলিকান অধ্যুষিত রাজ্যগুলোর অবস্থান দক্ষিণে, গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক ও পর্বতাঞ্চলীয় এবং মধ্য পশ্চিমে।

এমনকি প্রতিটি রাজ্যের অভ্যন্তরেও দলীয় অবস্থানের তারতম্য রয়েছে। বিভিন্ন শহরের ভিতরে ও শহরতলীর কেন্দ্রে ডেমোক্রেটদের অবস্থান শক্তিশালী। অন্যদিকে শহরতলীর বাইরে ও গ্রামীণ এলাকায় রিপাবলিকানদের শক্ত ভিত রয়েছে। ডেমোক্র্যাটরা হাই-টেক এলাকাগুলোতে ভালো করছে। অন্যদিকে রিপাবলিকানরা এগিয়ে যাচ্ছে এমন সব জায়গায় যেখানকার জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকাগুলোতে। আটলান্টার (জর্জিয়া) পুরো এলাকাসহ দক্ষিনাঞ্চলের শহরতলীগুলোতে রিপাবলিকানরা খুবই ভালো করেছে।

সামগ্রিকভাবে রিপাবলিকানরা নিজেদেরকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রক্ষণশীল, ব্যবসায়ী ও নারী, দক্ষিণ, মধ্যপশ্চিম এবং শহরতলী ও গ্রামীণ এলাকার দল হিসেবে ভাবতে পারে। অন্যদিকে ডেমোক্রেটিক দলের সমর্থকদের মধ্যে রয়েছে সংখ্যালঘু, অসাম্প্রদায়িক, সামাজিক উদারপন্থী, ইউনিয়ন হাউসহোল্ড, নিম্ন আয়ের মানুষ এবং বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের মানুষ। তবে অবশ্যই সাধারণ প্রবণতার ওপর ভিত্তি করেই এই শ্রেনী বিভাগ করা হয়েছে। সকল এলাকার মানুষের মধ্যেই রাজনীতির দিক থেকে বৈচিত্র্য রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট কী কী সুবিধা বা অসুবিধার মুখোমুখি হয়ে থাকেন?

উত্তর ঃ প্রথমত, ইতিহাসের নিরিখে বাস্তব তথ্য হচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সফল হয়েছেন। তবে সবাই না। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখেছি কয়েকজন ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ব্যর্থ হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট বুশ সিনিয়র ১৯৯২ সালে এবং প্রেসিডেন্ট কার্টার ১৯৮০ সালে, উভয়ই প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় নির্বাচন করেও পরাজিত হন। এ কথা খাটে জেরাল্ড ফোর্ডের বেলায়ও। তিনিও ১৯৭৬ সালে পুনর্নির্বাচনে হেরে যান।

তবে সাধারণভাবে প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় তারা দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন। এর কারণ তারা নিজ দল থেকে কোনো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন না। অর্থাৎ তারা প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় ওই দল থেকে অন্য কোনো প্রার্থী মনোনয়ন চান না। তবে ব্যতিক্রম দেখা যায় প্রেসিডেন্ট বুশ সিনিয়র, জিমি কার্টার এবং ফোর্ডের বেলায়। তারা তিন জনই প্রাথমিক মনোনয়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিলেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ তার দল থেকে কোনো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েননি। অর্থাৎ রিপাবলিকান দল থেকে তাকে চ্যালেঞ্জ করে অন্য কেউ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেননি। এটা তার জন্য একটা বড় সুযোগ।

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট এমন একটি অবস্থানে থাকেন, যে অবস্থানে থেকে সরকারের নির্ধারিত কার্যসূচীর ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়। জনগণের জন্য যে কাজগুলো ভালো ফল বয়ে আনবে সেগুলোর ব্যাপারে জনগণের মনোযোগ আকর্ষন করা যায়। মাঝে-মধ্যে বৈদেশিক নীতি বা অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক নীতির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন, যাতে এটা নির্বাচনে তাদের পক্ষে সুবিধা হিসেবে কাজ করে।

এখন অসুবিধার কথা বললে বলতে হবে, ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টকে তার সময়ে ঘটা ভালো কাজের জন্য প্রশংসা করা হয়, আবার মন্দ কাজের জন্য নিন্দা করা হয়। কাজ ভালো হোক বা মন্দ হোক, তার দায় ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের উপরই বর্তায়। তবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে একটি ভালো সময়ই পুনর্নির্বাচন করা উচিত এবং সেটাই আদর্শ। ক্ষমতায় থাকাকালে যখন অর্থনীতি নিচের দিকে, যখন পররাষ্ট্রনীতি খারাপের দিকে গিয়েছে, তখন নির্বাচন অনুষ্ঠান অবশ্যই যেকোনো প্রেসিডেন্টের জন্য খারাপ ফল বয়ে আনে। নির্বাচনটা আসলে বিভিন্ন বিবেচনায় ক্ষমতাসীন প্রশাসনের অর্জিত সাফল্যের ওপর একটি গণভোটস্বরূপ। মোট কথা, সময় ভালো হলে তা প্রেসিডেন্টের জন্য ভালো; আর সময় খারাপ হলে, তা প্রেসিডেন্টের জন্য খারাপ।

প্রশ্নঃ প্রেসিডেন্ট হিসেবে মিস্টার বুশের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাট প্রতিযোগিরাও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে যেমন সিনেটর, কংগ্রেসম্যান, অঙ্গরাজ্যের গভর্নর, সামরিক বাহিনীর জেনারেল হয়ে বসে আছেন। এই অবস্থান কিভাবে তাদের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুযোগকে প্রভাবিত করবে?

উত্তরঃ বলা হয়ে থাকে মার্কিন সিনেটের অধিকাংশ সদস্য প্রত্যেকদিন ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে আয়নায় মুখ দেখে নিজেকে সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু সিনেটরদের মধ্য থেকে খুব অল্প সংখ্যককেই প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। সিনেট থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

হয়েছেন এ রকম সর্বশেষ ব্যক্তি হলেন জন কেনেডি। তিনি ১৯৬০ সালে নির্বাচিত হন। এরপরে বেশ কয়েকজন সিনেটর প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত হলেও তাদের সবাই পরাজিত হয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ১৯৯৬ সালে বব ডোল, ১৯৭২ এ জর্জ ম্যাকগভার্ন। এর মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়েছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার জন্য সিনেট বিশেষভাবে আকর্ষণীয় কোনো জায়গা নয়।

অধিকাংশ প্রার্থী যারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন, তারা হয় ভাইস প্রেসিডেন্ট থেকে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন অথবা কোনো অঙ্গারাজ্যের গভর্নর থেকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য আগে ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়া এখন একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। যদিও ২০০০ সালে ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর প্রেসিডেন্ট পদে দাড়িয়ে নির্বাচিত হতে পারেননি। তবে গভর্নর থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার উদাহরণ সবচেয়ে বেশি। সর্ব সাম্প্রতিক জর্জ ডব্লিউ বুশ, তার আগে বিল ক্লিনটন, রোনাল্ড রিগ্যান, জিমি কার্টার। এটা আসলে একটা দারুণ রেকর্ড। উনিশ শতকে প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য সামরিক বাহিনীর সদস্য হওয়া প্রায় বাধ্যতামূলক ছিলো। কিন্তু আধুনিক যুগে কেবল আইসেনআওয়ার মিলিটারি কমান্ডার থেকে কমান্ডার ইন চিফ হন।

প্রশ্ন ঃ নির্বাচনে অর্থ খরচের আইন ফলাফলে কিভাবে প্রভাবিত করে?

উত্তর ঃ ২০০০ সালের মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারি তহবিল থেকে অর্থ গ্রহনকে অস্বীকার করেন বুশ। তবুও তিনি প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হয়েছিলেন, এদিক থেকে তিনি প্রথম সফল ব্যক্তি। সরকারী তহবিল থেকে অর্থ না নেয়ায়, আইন অনুযায়ী তিনি ওই সময়ে অনির্ধারিত পরিমাণ অর্থ খরচ করার সুযোগ পান। তিনি খরচ করেন ১০০ মিলিয়ন ডলার। বুশ যদি সরকারি অর্থ নিতেন তাহলে তিনি আইন অনুযায়ী এতো খরচ করতে পারতেন না। ২০০৪ সালে ব্যক্তির কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ আইন ১ হাজার ডলার থেকে দ্বিগুণ করে ২ হাজার ডলার করা হয়। এসময়ে বুশের নির্বাচনী প্রচারণায় আরেকবার সরকারি তহবিল থেকে অর্থ গ্রহণ ত্যাগ করা হয়। তিনি দলীয় তহবিল থেকে অর্থ যোগাড় করেন। মনোনয়ন প্রক্রিয়ার সময় এটা বেড়ে ২শ মিলিয়ন ডলারে গিয়ে পৌছায়। বুশ তার দল রিপাবলিকান পার্টি থেকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি না হওয়ায় তিনি একাই প্রচারণার ওই অর্থ ব্যবহারে সমর্থ হন। এটা ছিলো তার জন্য একটি বিস্ময়কর সুবিধা।

দলের প্রাথমিক মনোনয়নের সময়ে কোনো ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীরই ওই পরিমাণ অর্থ যোগানের সামর্থ্য ছিলো না। যদি তারা সরকারি তহবিল গ্রহণ করতেন, তাহলে তারা ৫০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ের কাছাকাছি পৌছে যেতেন। এর অধিকাংশ ব্যয় হবে ২০০৩ সালে এবং ২০০৪ সালের শুরুর দিকে দলের

মনোনয়নে বিজয়ী হতে প্রচারণার জন্য। এর পর সম্মেলনের পরে যিনি মনোনয়ন পাবেন তার জন্য খুব কম অর্থই থাকবে বাকী প্রচারণার জন্য।

প্রাথমিক প্রচারণা এবং দলের সম্মেলন শেষ হওয়ার পরে প্রার্থীদের আরেকটি সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে। সেটি হলো নির্বাচনে তারা সরকারি অর্থ গ্রহণ করবেন, কী করবেন না। প্রত্যাশা করা হচ্ছে, রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটিক, উভয় প্রার্থীই সরকারি তহবিল থেকে গ্রহণ করবেন।

প্রশ্ন ঃ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মত এতো বড় একটি প্রতিযোগিতার ফলাফলে অর্থ কী একটি বড় ব্যবধান হয়ে দাড়াবে?

উত্তর ঃ কিছু কিছু প্রতিযোগিতায় অর্থ ব্যবধান তৈরির চেয়েও বড় কিছু করে। তবে দেখতে হবে কোন পরিবেশের অধীনে এটা কাজ করছে। প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচনে টাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়ায়। মার্কিন সিনেট নির্বাচনে এবং গভর্নর নির্বাচনেও টাকা দরকার হয়। কারণ প্রচুর টাকা প্রয়োজন হয় বিশেষ করে জনগণের কাছে প্রার্থীদের পরিচয় ও অবস্থান তুলে ধরতে।

প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় অর্থের প্রয়োজন হয়। কারণ প্রার্থীদের অধিকাংশই জনগণের কাছে অপরিচিত থাকেন। প্রার্থীদেরকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে, তাদের অবস্থান তুলে ধরতে টাকার প্রয়োজন হয়। এর ভিতর দিয়ে তাদের দলও এগিয়ে যায়। তবে একটি সাধারণ নির্বাচনে এটা কিছুটা কম গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রায় নিখরচায় মিডিয়ার মনযোগ কাড়া যায় কেবল প্রতিযোগিতাটির গুরুত্বের কারণে। টেলিভিশনে তাদের বিতর্ক সম্প্রচারিত হয়। জনগণ তাদের দলীয় প্রার্থীকে এর ভিতর দিয়ে খুঁজে নেয়। তাছাড়াও বলা যায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে অর্থ একটা ব্যবধান তৈরি করে বৈকি।

প্রশ্ন ঃ ২০০৪ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হবে যে তিনি বর্তমান প্রেসিডেন্ট বুশের সমালোচনা করতে পারবেন। এছাড়া নির্বাচনে জিততে ডেমোক্র্যাটদের কী আর কোনো ইতিবাচক বিষয় প্রয়োজন আছে?

উত্তর ঃ বিজয়ী হওয়ার জন্য ডেমোক্র্যাটদের মাত্র দুটি জিনিসের প্রয়োজন। সবচেয়ে গুরুতপূর্ণ হচ্ছে, তাদের এমন একটি কারণ প্রয়োজন যাতে ভোটাররা জর্জ বুশকে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচিত না করেন। তবে জর্জ বুশের নেতৃত্বে দেশ কেমন চলছে, সে বিষয়ে নেতিবাচক প্রচারণা করে খুব বেশি ফল আসবে না।

ডেমোক্রেটদের জন্য হোয়াইট হাউজ পুনরুদ্ধার এবং কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ লাভের সুযোগ রয়েছে। তাদের এমন অনেক ভোটের প্রয়োজন যারা মনে করে, ''সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে অস্পষ্ট সফলতা এবং ইরাকে

অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে আমি আমার দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ নিয়ে কমই নিরাপদ বোধ করি এবং দৈহিকভাবেও আমি নিজেকে নিরাপত্তহীন মনে করি।" ২০০৪ সালে ডেমোক্র্যাটদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য এটি পর্যাপ্ত না হলেও খুবই প্রয়োজনীয় একটি ইস্যু।

দ্বিতীয়তঃ, ডেমোক্র্যাটদের শুরুতেই জনগণের বিশ্বস্ততা অর্জন করা দরকার। তাদের এমন একজনকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করতে হবে যিনি নিরাপত্তা রক্ষায় একটি নীতি প্রণয়ন করে আমেরিকানদের বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম। আর ওই নীতি পাগলাটে বা চরম অথবা আমেরিকানদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হলে চলবে না।

সুতরাং, হ্যাঁ, ডেমোক্র্যাটদের এমন একজনকে প্রার্থী দিতে হবে যিনি একটি ন্যায়সঙ্গত জাতীয় নিরাপত্তা নীতি, ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ নীতি কৌশলকে সামনে তুলে ধরবেন। অধিকাংশ আমেরিকান সরাসরি প্রেসিডেন্ট বুশের নীতির সঙ্গে ডেমোক্র্যাটদের নীতির তুলনা করতে চাচ্ছেনা। বরং এই ক্ষেত্রে আমেরিকানরা বর্তমান প্রেসিডেন্টের রেকর্ডের পুনরাবৃত্তি না করার পক্ষপাতি। তারা এখন ডেমোক্র্যাটদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করছে এবং বলছে, আমরা কি তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারি? আর এখানেই বিরোধীদের একটি ন্যায়সঙ্গত ইতিবাচক পথ ধরে এগুতে হবে।

প্রশ্নঃ এখানে একটি পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যে, প্রাইমারি নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা চরম অবস্থান গ্রহণ করেন যেন তারা তাদের দলীয় স্বার্থকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। যেমন এক্ষেত্রে ডেমোক্র্যাটরা হচ্ছে বাম আর রিপাবলিকানরা হচ্ছে ডানপন্থী। এই বিষয়টি কি ভবিষ্যতে রাজনৈতিক আচরণে প্রভাব ফেলবে?

উত্তরঃ সাম্প্রতিক নির্বাচনে সফল প্রেসিডেন্ট প্রার্থীরা এ ধরনের ফাঁদে পা দেননি। উদাহরণ স্বরূপ ২০০০ সালে রিপাবলিকান প্রাইমারিতে প্রেসিডেন্ট বুশ তার রক্ষণশীল ভিত্তির ওপর একটি স্বাধীন নীতির প্রস্তাব করেন যার ফলে তার দলের লোকজন খুশি হয়েছিল। কিন্তু মনোনয়ন লাভের পর তার উদারপন্থি বক্তব্যের কারণে তাকে চরম রক্ষণশীল বা চরম ডানপন্থি হিসেবে বিশেষায়িত করা যায়নি।

সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তার নিজের দলের মধ্যেই প্রথাগত বাম বনাম ডান বিতর্ককে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি দলীয় ভোটার ও ভাসমান ভোটারদের কাছে অন্যভাবে তার আবেদন তুলে ধরেছেন। হ্যাঁ, এটি ঠিক যে, প্রাইমারির কর্মীরা আরো বেশী আদর্শিক হয়। রিপাবলিকানদের ক্ষেত্রে ডান এবং ডেমোক্র্যাটদের ক্ষেত্রে বামপন্থি হয়। কিন্তু ভোটারদের কাছে আবেদনের কাঠামো এবং ইস্যু এমন উপায়ে তুলে ধরা সম্ভব যা সাধারণ নির্বাচনে আপনার অবস্থানের ক্ষতি করবে না।

প্রশ্নঃ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আপনি কি ইন্টারনেটের বর্ধিত কোন ভূমিকা লক্ষ্য করছেন?

উত্তরঃ বর্তমান প্রেক্ষিতে ইন্টারনেটকে না গণযোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা যায়, না টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এর পরিবর্তে বরং নির্বাচনী প্রচারণার স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ ও তাদের সংগঠিত করা, অর্থ তোলা, তৃণমুল পর্যায়ের কর্মপন্থায় সমন্বয় এবং সমর্থকদের কাছে তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেট গুরুত্বপুর্ণ নিয়ামক হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে। হাওয়ার্ড ডিন ২০০০ সালে জন ম্যাককেইনসের জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে বেশ মোটা অংকের অর্থ তুলেছিলেন। ডিন ও অন্যান্য ডেমোক্র্যাটরা এটিকে সংগঠন গঠনের নিয়ামক হিসেবে ব্যবহার করছেন।

ইন্টারনেট নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের এই ব্যবহার রিপাবলিকানদেরও আগ্রহী করে তুলেছে। তারা এটির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। তারা অর্থ তোলা, তাদের স্থানীয় সংগঠন তৈরী এবং রিপাবলিকান কর্মীদের নির্বাচনে আগ্রহী ও অর্থ বরাদ্দে উৎসাহিত করতে এর ব্যবহার করছে।

সুতরাং এইসব দিক বিবেচনায় নির্বাচনে ইন্টারনেট গুরুত্বপুর্ণ হয়ে উঠছে।

প্রশ্নঃ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ছাড়াও প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের নির্বাচন হবে। এই সব নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেমন হবে বলে মনে করেন?

উত্তরঃ কোন দলই বিপুল ভোটে জিততে পারবে বলে ঠিক এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এই নির্বাচনে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

১৯৯৪ সালের নির্বাচন থেকে প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান দল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সিনেটেও স্বল্প ব্যবধানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তবে রিপাবলিকান সিনেটর জিম জেফর্ডস দল ত্যাগ করলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। ২০০২ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকানরা আবার সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। প্রতিনিধি পরিষদ এবং সিনেট নির্বাচনের কাঠামোর দিকে তাকিয়ে অনেক বিশ্লেষক বলেছেন, বর্তমান দশকের বাকি অংশটিও তারা এই জায়গায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখবে।

আর এই কারণে প্রতিনিধি পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপুর্ণ ইলেকটোরাল ডিস্ট্রিক্টে ডেমোক্র্যাটদের সদস্য সংখ্যা কম। এর ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। রিপাবলিকানদের সাম্প্রতিক সফলতায় এর আংশিক অবদান রয়েছে। তারা এর সাহায্যে রাজ্য পর্যায়ে রিডিস্ট্রিক্ট প্রক্রিয়া আরো দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করে কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টে তাদের সমর্থকদের ভোটের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত করেছে। আসন্ন নির্বাচনে ৪৩৫ আসনের মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। ক্ষমতাসীন দল হিসেবে রিপাবলিকানরা এখন সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। তারা এখন আরো বেশী অর্থ তুলতে পারবে এবং সফলতার সঙ্গে রিডিস্ট্রিক্ট করতে পারবে। তবে হ্যাঁ, সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে হয়তো তাদের কিছুটা বেগ পেতে হবে।

সিনেটে রিপাবলিকানদের চেয়ে ডেমোক্র্যাটদের অবস্থা ভাল। স্মরণ রাখতে হবে, সিনেটের এক তৃতীয়াংশের নির্বাচন খুব শিগগিরই হবে। তাদের ছয় বছরের মেয়াদ প্রায় শেষের দিকে। সিনেট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের আসন আরো বাড়তে পারে। আর ২০০০ সালে বুশ যেসব এলাকায় জিতেছেন সেসব রক্ষণশীল এলাকায় তাদের এই আসনগুলো বাড়তে পারে ।

সুতরাং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা কেবল তখনই বিপুল ব্যবধানে জিততে পারবে যদি তারা কংগ্রেসে

==========

Election 2004 পুস্তিকা থেকে অনূদিত।

জিআর/ ১৪ই অক্টোবর, ২০০৪

কংগ্রেস নির্বাচন

জন এইচ. অলড্রিক

সংবাদ মাধ্যমগুলোর মনোযোগ যদিও ২০০৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে ঘিরেই থাকবে, কিন্তু একই সঙ্গে আমেরিকানরা হাজার হাজার প্রার্থীদেরকে নির্বাচিত করবে দেশের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের নির্বাচন প্রায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মতোই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে কংগ্রেসে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার ভারসাম্য প্রায় কাছাকাছি। বস্তুত, নিম্ন কক্ষে বা প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকানরা মাত্র ১২ আসন বেশি (৪৩৫ আসনের মধ্যে) পেয়েছে এবং উচ্চ কক্ষে অর্থাৎ সিনেটে তারা ১০০ আসনের মধ্যে লাভ করেছে ৫১টি।

কংগ্রেস নির্বাচন অতীব গুরুত্বপূর্ণ কারণ দেশের নীতি নির্ধারণে কংগ্রেস মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আমেরিকান সরকারী ব্যবস্থা সংসদীয় ব্যবস্থার মতো নয়, এই ব্যবস্থায় কংগ্রেস এবং প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা আলাদা করা হয়েছে। সমস্ত আইন কংগ্রেসে লিখিত এবং কংগ্রেস দ্বারা পাশ হতে হবে। সংসদীয় ব্যবস্থায় যেমনটি হয়ে থাকে, সেরকম দলীয় নীতিমালা এখানে প্রায়শঃই কঠোরভাবে অমান্যই করা হয়ে থাকে। কংগ্রেসের সদস্যরা নীতিমালার ওপর স্বাধীনভাবে ভোট দিয়ে থাকে যেটি তারা সর্বোত্তম বলে মনে করে। নিজেদের পুনর্নির্বাচনে জয়লাভের জন্য যেটা গুরুত্ব বহন করবে, যা জয়লাভের জন্য সহায়ক বলে মনে হবে সেভাবেই সদস্যরা ভোট দিয়ে থাকে। ফলে, কংগ্রেস নেতাদেরকে জয় লাভের জন্য দলের ঐক্যবদ্ধ সমর্থনের ওপর নির্ভর না করে এক সদস্য বিশিষ্ট জোট গড়ে তুলতে হয়। এ কারণে কংগ্রেসের প্রতিটি জয়-পরাজয়ই দুই দলের জন্য হয়ে ওঠে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিটি দফতরের জন্য পৃথক ও স্বাধীন নির্বাচন করার অর্থ এই যে, এতে করে একটি দলের পক্ষে কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং অন্যদিকে, আরেকটি দলের একজন সদস্যের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হতে পারে। সরকারের মধ্যে এই তথাকথিত ক্ষমতার বিভাজন খুবই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। বিগত ২৪ বছরের মধ্যে ১৬ বছরই এরকমভাবে ভিন্ন ভিন্ন দল প্রতিনিধি পরিষদ এবং প্রেসিডেন্ট পদকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ১৯৯৪ সাল থেকে পরিষদে রিপাবলিকানদের প্রাধান্য রয়েছে। ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের আট বছর শাসনামলের শেষ ছয় বছর অর্থাৎ ১৯৯৪ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তারা সিনেটকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে।

শেষ পর্যন্ত ২০০০ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকানরা প্রেসিডেন্ট পদে জয়লাভ করে এবং পরিষদেও তাদের প্রাধান্য বজায় রাখে। সিনেটে দুই দলই লাভ করে ৫০টি করে অর্থাৎ সমান সংখ্যক আসন। আমেরিকার সংবিধানে ভাইস প্রেসিডেন্টকে (রিপাবলিকান ডিক চেনি) সিনেটে টাই-ব্রেকিং ভোট দেয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। আর তাই ২০০০-এর নির্বাচনের পর খুবই স্বল্প ব্যবধানে রিপাবলিকানরা সিনেটে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং এতে কেন্দ্রীয় সরকারে রিপাবলিকানদের একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে।

২০০১-এর জুন মাসে রিপাবলিকান সিনেটর জেমস জেফোর্ডস রিপাবলিকান পার্টি ত্যাগ করেন। ফলে সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের সামান প্রাধান্য ফিরে আসে এবং পুনরায় বিভক্ত সরকার সৃষ্টি হয়। এতে করে ডেমোক্র্যাটরা যে সূক্ষ্ম সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল, ২০০২-এর নির্বাচনের পর তারা আবার তা হারায়, রিপাবলিকানরা তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ফেরত পায়।

কংগ্রেস কিভাবে সাজানো হয়

প্রতিনিধি পরিষদ এবং সিনেট প্রায় সমান ক্ষমতার অধিকারী, তবে তাদের নির্বাচিত হবার মাধ্যম প্রায় সম্পূর্ণই আলাদা। আমেরিকা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা চেয়েছিলেন যে পরিষদের সদস্যরা যেন জনগণের কাছাকাছি থাকেন, আইন প্রণয়নকালে তারা যেন তাতে জনগণের আশা-আকাঙ্খার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিফলন ঘটান। আর তাই, প্রতিষ্ঠাতাগণ এমনভাবে পরিষদের নকশা করেছিলেন যাতে তা তুলনামূলকভাবে বড় হয় এবং সেখানে যেন ঘন ঘন (দুই বছর অন্তর) নির্বাচন হয়। প্রাথমিকভাবে, এই দুই বছর মেয়াদ কারো কারো কাছে খুবই লম্বা বলে মনে হয়েছিল। আর আজকের দিনে, এটা অনেক বেশি উদ্বেগের বিষয় যে ঘন ঘন নির্বাচনের অর্থ হচ্ছে প্রার্থীরা সব সময়ই পুনর্নির্বাচনের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে এবং এর ফলে

দেশের জন্য কোনটি ভাল তা ভাবার মতো অবকাশ কমই পাবে। তাদের কাছে সেই বিষয়টিই মুখ্য হবে যে নির্বাচনে ভাগ্য নির্ধারণে কোনটি সহায়ক হবে।

পরিষদের প্রত্যেকটি আসনই এক একটি ভৌগোলিক নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করে এবং প্রত্যেক সদস্যই একটি একক, অর্থাৎ বহুত্ববাদ দ্বারা একটি জেলা থেকে একজন মাত্র সদস্যই নির্বাচিত হয়। সবচাইতে বেশি সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত প্রার্থীই নির্বাচনে জয়লাভ করে। ৫০টি রাজ্যের প্রত্যেকটিরই পরিষদে কমপক্ষে একটি করে আসন সংখ্যা নিশ্চিত থাকে। এছাড়া রাজ্যগুলো অন্য যে সব আসন লাভ করে তা তাদেরকে বরাদ্দ করা হয় জনসংখ্যা দ্বারা। যেমন, আলাস্কার জনসংখ্যা অত্যন্ত কম এবং তাই পরিষদে এর আসন সংখ্যা মাত্র একটি। অন্যদিকে, ক্যালিফোর্নিয়া সবচাইতে বড় রাজ্য এবং বর্তমানে এই রাজ্যের আসন সংখ্যা ৫৩টি।

সিনেট এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে তা রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এবং বস্তুত, প্রথম দিকে রাজ্যের আইনপ্রণেতারাই সিনেটরদের নির্বাচিত করতেন। ১৯১৩ সালে সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনী পাশ না হওয়া পর্যন্ত সিনেটররা তাদের রাজ্যের ভোটারদের দ্বারা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হতেন। প্রত্যেক রাজ্য থেকে দুইজন করে সিনেটর ছয় বছর মেয়াদে নির্বাচিত হতেন, আর এক-তৃতীয়াংশ সিনেট আসনে প্রতি দুই বছর পর পর পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো। এর ফলে, পরবর্তীতে সিনেটররা ইলেক্টরেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাছাই হতেন এবং একেকটি রাজ্য পরিগণিত হতো একেকটি নির্বাচনী এলাকা হিসেবে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচনে বিশেষ করে একক নির্বাচনী এলাকায় দ্বিদলীয় একটি ব্যবস্থার উদ্ভব হতে পারে। এর কারণ এই যে তৃতীয় কোন দলের প্রার্থীর জয় লাভের খুব কমই সম্ভাবনা রয়েছে। ভোটাররা তাদের ভোট "অপচয়" করতে তেমন পছন্দ করে না, কেননা তারা সেই সব প্রচারণাকে তারা তেমন আশাব্যঞ্জক বলে মনে করে না। আর সে কারণেই যে সব প্রার্থী নির্বাচনে জয় লাভ করতে চান তারা নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা নেই এমন দলের সাথে নিজেদেরকে জড়াতে চান না। যেহেতু এখানে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের কোন ব্যবস্থা সংরক্ষিত নয় বলে সংখ্যালঘুরা অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় বিচ্ছিন্ন কোন দলের সাথে জড়িত হবার বদলে দু'টি শক্তিমান দলের যে কোন একটির সাথে নিজেদেরকে সংশ্লিষ্ট করতে চায়। যুক্তরাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ইতিহাস ঘেঁটে দেখা গেছে যে এ দেশে কখনোই দু'টির অধিক প্রধান দল ছিল না। বর্তমানে, এমনকি "প্রার্থী-কেন্দ্রিক" নির্বাচন হিসেবে পরিচিত নির্বাচনেও তৃতীয় দলগুলো এবং প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে, কিন্তু তারা খুব কমই জয় লাভ করে থাকে। ২০০২-এর নির্বাচনের পর

যুক্তরাষ্ট্র নিম্ন পরিষদের ৪৩৫ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র দুই জন ছিলেন নির্দলীয় প্রার্থী। আর ১০০ সদস্য বিশিষ্ট সিনেটে একজন মাত্র নির্দলীয় সিনেটর নির্বাচিত হয়েছিলেন । ১৮৬০ সাল থেকে আমেরিকায় যে দু'টি দল প্রাধান্য বিস্তার করে আসছে, সেই রিপাবলিকান পার্টি অথবা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থীরা উভয় কক্ষেরই অন্য সকল আসনে জয় লাভ করেছিলেন।

কংগ্রেস নির্বাচনে গুরুত্বপুর্ণ বিষয়গুলো

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে বেশির ভাগ সময়ে দেখা গেছে, কংগ্রেস নির্বাচন ছিল "দল-কেন্দ্রিক।" কারণ বেশির ভাগ ভোটারই বহু দিন যাবৎ যে কোন একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে থাকে, তারা তাদের ভোট প্রদান করে থাকে তাদের সমর্থিত দলকে। কংগ্রেসের সদস্যরা প্রায়শঃই পুনর্নির্বাচিত হতেন এবং অনেক সময়ই দেখা যেতো যে তারা দশকের পর দশক ধরে তাদের আসনে অধিষ্ঠিত থাকতেন। এর কারণ হচ্ছে তাদের নির্বাচনী এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাদের দলকে সমর্থন করতো। ব্যক্তিগত প্রার্থী হিসেবে তাদের প্রচেষ্টা ও কর্মকান্ড ভোটারদের দলের প্রতি সমর্থনে খুব একটা প্রভাব ফেলতো না। অতি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দলের প্রতি ভোটারদের আনুগত্যের পাশাপাশি প্রার্থীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং তার অন্যান্য বিষয়াদিও ভোটারদের কাছে গুরুত্বপুর্ণ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

বস্তুত, ১৯৬০-এর দশক থেকে জাতীয় নির্বাচন ক্রমেই আরো বেশি করে প্রার্থী-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। টেলিভিশনে প্রচারণা চালাতে, বিপুল পরিমাণ চাঁদা তুলতে, নির্বাচন পরিচালনা করতে এবং আধুনিক নির্বাচনী প্রচারণা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে প্রার্থীদের দক্ষতা ব্যক্তি হিসেবেও প্রার্থীদের প্রতি ভোটারদেরকে আরো সচেতন করে তুলেছে। এর ফলে, ভোটাররা দলের প্রতি প্রার্থীদের আনুগত্য পরিমাপের পাশাপাশি তাদের শক্তি ও দুর্বলতাও বিবেচনা করে থাকে।

প্রার্থী-কেন্দ্রিক নির্বাচন কংগ্রেসের বর্তমান সদস্যদের জন্য একটা বড় ধরনের সুবিধা। কংগ্রেসের সদস্যরা সাধারণত যারা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে থাকে সেই সদস্যদের চাইতে টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রে অনেক বেশি প্রচার ও চেহারা দেখানোর সুযোগ পেয়ে থাকে। সংবাদ মাধ্যমে বেশি বেশি প্রচার লাভ এবং সরকারী নীতির ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাবের ফলে কংগ্রেসে আসীন সদস্যরা বিপুল পমিাণে চাঁদা তুলতে পারে যা দিয়ে তারা নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে থাকে। এই সমস্ত এবং আরো অন্যান্য কারণে যে সকল সদস্য পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তাদের জয় লাভের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি থাকে। ২০০২ সালে ২৯৮ জন পরিষদ সদস্য পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এদের মধ্যে মাত্র ১৬ জন পরাজিত হয়েছিলেন, আর অন্যদিকে ২৬ জন সিনেটর যারা পুনরায় নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের মধ্যে মাত্র

তিনজন হেরেছিলেন। সিনেটে পুনর্নির্বাচনের হার ৮৮ শতাংশ এবং পরিষদে পুনর্নির্বাচনের হার ৯৬ শতাংশ হলেও এটা বলা চলে যে কংগ্রেসের নির্বাচন কেবলমাত্র প্রার্থী-কেন্দ্রিক নয়, বরং তা ইতিমধ্যেই সেখানে আসীন সদস্য-কেন্দ্রিক।

প্রচুর পরিমাণে অর্থ এবং সংবাদ মাধ্যমে প্রচার পেয়ে সদস্যরা জয় লাভ করে কারণ তারা নির্বাচকমন্ডলীর কাছে ইতিমধ্যেই পরিচিত। কিন্তু তাদেরকে যারা চ্যালেঞ্জ করে থাকে তারা সেই তুলনায় ভোটারদের কাছে পরিচিত নয়। জরিপে দেখা গেছে যে যাদেরকে জরিপ করা হয়েছে তাদের প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জনই তাদের পরিষদের অথবা সিনেটের সদস্যের নাম জানে। অপরপক্ষে, এই সংখ্যা এমনকি অর্ধেকেরও বেশি নয় যারা নির্বাচনী প্রচারণা শেষ হয়ে যাবার পরও এই সদস্যদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে চেনে বা জানে। কারণ চ্যালেঞ্জাররা তেমন একটা পরিচিত নয়, এমনকি যারা চাঁদা দিয়ে থাকে তাদেরকে রাজি করাতেও তাদের অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এতে একটি দুর্ভাগ্যজনক চক্রের সৃষ্টি হয়েছে যেখানে সম্ভাব্য শক্তিশালী প্রার্থীরা প্রায়শঃই প্রতিষ্ঠিত সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় না এবং যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকে তারা তাদের প্রচারণা শুরু করার মতো অর্থই তুলতে সক্ষম হয় না।

রাজনৈতিক অ্যাকশন কমিটিগুলো (পিএসি) কংগ্রেস প্রার্থীদেরকে যে পরিমাণ অর্থ চাঁদা হিসেবে প্রদান করে থাকে তাতে করে কংগ্রেস নির্বাচনে অর্থ দল এবং প্রার্থীতার গুরুত্বই প্রমাণিত হয়। ১৯৮৩ সাল থেকে ২০০০ (এ পর্যন্ত উপাত্ত পাওয়া গেছে) সাল পর্যন্ত প্রধান দু'টি দলে 'পিএসি'-র প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণ ১ নম্বর চিত্রে দেখানো হয়েছে। এই চিত্রে এই সময়কালের মধ্যে নির্বাচনগুলোতে অর্থের প্রবাহের সার্বিক বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। এখানে আরো উল্লেখ্য যে ১৯৯৪ সাল থেকে ডেমোক্র্যাটরা উল্লেখযোগ্য হারে 'পিএসি' সমর্থন লাভ করেছে, অর্থাৎ যে বছরগুলোতে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল। বিগত তিনটি নির্বাচনে 'পিএসি' সমর্থন লাভে রিপাবলিকানরা ডেমোক্র্যাটদের প্রায় ধরে ফেলেছে। এই রকম জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাথে দুই দলই বর্তমানে 'পিএসি' থেকে প্রায় সমান পরিমাণ চাঁদা লাভ করে থাকে।

দ্বিতীয় চিত্রে দেখা যাচ্ছে একই সময় কালের মধ্যে সদস্যদের এবং তাদের চ্যালেঞ্জারকে দেয়া 'পিএসি'-র অনুদানের পরিমাণ। ইতিমধ্যেই নির্বাচিত সদস্যরা চাঁদা উত্তোলনে যে ব্যাপক সুবিধা পেয়ে থাকে তা প্রতিটি নির্বাচনেই সুস্পষ্ট। বস্তুত, 'পিএসি' থেকে সদস্যরা যে পরিমাণ অনুদান লাভ করে তাকে বিগত দুই দশকে তার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা যে চাঁদা লাভ করতো তা অনেক হ্রাস পেয়েছে। এই চিত্র থেকেই উপলব্ধি করা সম্ভব যে সদস্যদের পুনর্নির্বাচিত হবার হার কেন এতো বেশি।

প্রতিদ্বন্দ্বীরা যখন নির্বাচকমন্ডলীর সত্যি সত্যি পরিচিত হয়ে ওঠে, তখন ভোটাররা দু'জন প্রার্থীকেই অনেকটা সমান দৃষ্টিতে বিবেচনা করে। তখন তারা সেই প্রার্থীকেই ভোট দিয়ে থাকে যার যোগ্যতা অধিকতর শক্তিশালী বলে তারা বিশ্বাস করে।

কংগ্রেস নির্বাচনে কোন আবেদনগুলো সবচাইতে বেশি কার্যকর? অতি সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে এই সকল ধারণাও পাল্টে গেছে।

মাত্র কিছু দিন আগেও কোন কংগ্রেসীয় নির্বাচনী এলাকা বা ডিস্ট্রিক্ট-এর সুনির্দিষ্ট কিছু স্বার্থ এবং উদ্বেগের বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই সেই এলাকায় নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হতো। জাতীয় ইস্যুগুলো এখানে তেমন কোন গুরুত্ব পেতো না। বিশেষ করে "মধ্যবর্তী নির্বাচনের" ক্ষেত্রে এগুলো আরো বেশি প্রযোজ্য ছিল। অর্থাৎ, প্রেসিডেন্টের চার বছর মেয়াদের মধ্যবর্তী সময়ে যে নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হতো সেই নির্বাচনগুলোতে জাতীয় বিষয়গুলো তেমন প্রাধান্য পেতো না। এই স্থানীয় বিষয়ভিত্তিক নির্বাচনগুলো প্রার্থী-ভিত্তিক নির্বাচনের সাথে চমৎকারভাবে খাপ খেয়ে যেতো। এর ফলে প্রার্থীরাও তাদের নিজেদের নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিক্ট-এর বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে ও সেগুলোকে ব্যবহার করে তাদের নির্বাচনী ম্যান্ডেট তৈরি করতে পারতো। ১৯৯৪ সালের নির্বাচন ছিল একাট সন্ধিক্ষণ। সিনেটে রিপাবলিকান পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল এবং প্রতিনিধি পরিষদেও তারা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কাছ থেকে ৫২টি আসন ছিনিয়ে নিয়েছিল। এর ফলে বিগত ৪০ বছরের মধ্যে প্রথম বারের মতো তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। তাদের নেতা ও পরিষদের স্পিকার নিউট গিংরিচের কৌশলের অন্যতম অংশ ছিল 'কন্ট্র্যাক্ট উইথ আমেরিকা' নামে একটি দশ দফা আইন প্রণয়ন সম্বন্ধীয় কর্মসূচী। প্রচারণার শুরুতে পরিষদের রিপাবলিকান প্রার্থীদের বড় একটি অংশ এই চুক্তিটি অনুমোদন করেছিল এবং চুক্তিটি বিশেষ করে নির্বাচনের পরে আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। গিংরিচ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এই নতুন সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকান দল পরিষদের মাধ্যমে অতি দ্রুততার সাথে ১০০ দিনের মধ্যে চুক্তিটি পাশ করিয়ে নিয়ে আসবে। এতে তিনি অনেকটা সফলও হয়েছিলেন। এই লক্ষ্য রিপাবলিকান পার্টি এবং এর নেতৃত্বের চিত্রকে অনেকটা তুলে ধরেছিল। এটা একটি মানদণ্ড তৈরি করেছিল যার দ্বারা জাতীয় ইস্যুগুলো এবং জাতীয় দলের মতো একটি প্ল্যাটফর্ম মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৯৯৪ সালের পরে অনুষ্ঠিত দু'টি মধ্যবর্তী নির্বাচনই ১৯৯৪-এর নির্বাচনের মতোই অবাক করা ছিল। ১৯৩৪ সালের পর প্রথমবারের মতো ১৯৯৮-এ একজন ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের দল (এক্ষেত্রে যথাক্রমে পাঁচটি আসন এবং ছয়টি আসন) পরিষদে বিরোধী দলের আসন জিতে নেয়। কংগ্রেসে যদিও

রিপাবলিকানদের প্রাধান্য বজায় ছিল, ধরে নেয়া হয় যে তারা ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে হারছে। রিপাবলিকান পার্টির অনেকেই এই "পরাজয়ের" জন্য বিভিন্ন বিষয়ে দলের একটি পরিষ্কার জাতীয় অবস্থান না থাকাকেই দায়ী করে। ডেমোক্র্যাটরা ২০০২-এর নির্বাচনে আসন লাভ করতে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। একথা সত্যি হোক বা না হোক, পার্টির অনেক নেতাই পরাজয়ের কারণ হিসেবে দলের একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম-এর রূপরেখা প্রণয়ন না করতে পারা বলে মনে করে।

কংগ্রেস নির্বাচন ২০০৪

বিগত এক দশকে কংগ্রেস নির্বাচনের বিভিন্ন নাটকীয় মোড় ও ঘটনাবলী নির্বাচনের ফলাফল নিয় পূর্বাভাসকে দুরূহ করে তুলেছে। বস্তুত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যে আগেকার দিনে যেভাবে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো হতো, তা আর আজকের যুগে কার্যকর নয়। এছাড়া ভোটাররা যেভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে বর্তমানে তাও একটা পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু এর পরও ২০০৪ সালের নির্বাচনে আরো কিছু দেখার আছে।

২০০৪ এর নির্বাচনে সবচাইতে জরুরী প্রশ্ন হচ্ছে ডেমোক্র্যাটরা পরিষদে পুনরায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মতো যথেষ্ট আসন লাভ করতে পারবে কি না। সিনেটের মাত্র ৩৪টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, এর মধ্যে বর্তমানে ১৯টি আসন দখল করে রয়েছে ডেমোক্র্যাটরা। উপরন্তু, গেল বারের নির্বাচনে খুব কম রিপাবলিকানই জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পেরেছিল, এবং রাজ্যগুলোতে ২২টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে যা জর্জ ডব্লিউ বুশ ২০০০ সালে জিতেছিলেন। সুতরাং, এটা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার যে ডেমোক্র্যাটরা সিনেটের কোন আসনে জয় লাভের আশা করতে পারে। সুতরাং, সিনেটে রিপাবলিকান পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণই থাকবে বলে ধারণা করা যায়, এবং এর পর মনোযোগ দেয়া যায় পরিষদের প্রতি।

পরিষদের নির্বাচনের সম্পদকে গতিশীল করার জন্য দু'টি দলই সম্ভাব্য সবচেয়ে শক্তিশালী প্রার্থী নিয়োগ করার চেষ্টা করছে। অনেক কিছুই নির্ভর করছে পরিষদের জন্য নতুন প্রার্থী নিয়োগের ওপর, বিশেষ করে যাদের ইলেক্টোরাল-এর অভিজ্ঞতা রয়েছে, যেমন রাজ্য আইনসভার সদস্যগণ। সমানভাবে প্রয়োজনীয় হচ্ছে তাদের পার্টির প্রেসিডেন্ট মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থী পরিষদের প্রার্থীদের জয়লাভের সম্ভাবনা কতোটা সবল বা দুর্বল করে দেয়, বিশেষ করে যারা এমন সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে যে সব আসন থেকে বর্তমান সদস্যরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না। পরিষদের জন্য অভিজ্ঞ এবং সফল প্রার্থী এবং সে দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর শক্তিশালী প্রচারণার সমন্বয় দুই দলের মধ্যে আসন বন্টনে বড় ধরনের রদবদল সৃষ্টি করতে পারে।

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে যতো ভোটার যে দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে ভোট দেয়, সেই একই দলের কংগ্রেস সদস্য পদপ্রার্থীকে ভোট দেবার সংখ্যা কমে গিয়েছে। এই দুই ভোটই তুলনামূলকভাবে স্বাধীন। এছাড়া, ২০০০ সালে দুই দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীই প্রায় সমান পরিমাণ ভোট লাভ করলেও এই সমসংখ্যক ভোট দু'দলের কোনটিকেই কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খুব একটা সুবিধা দিতে পারেনি। একজন সদস্য যিনি পুনর্নির্বাচন করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং কংগ্রেসে দুই দলের ঘনিষ্ঠ ভারসাম্যের কারণে কংগ্রেসে দলীয় ভারসাম্য প্রেসিডেন্টের ভোটের ওপরই নিভর করছে। ইরাকের সাথে যুদ্ধ চলাকালে এবং এর অব্যবহিত পরের জরিপগুলোতে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ যে উচ্চ অনুমোদন হার লাভ করেছেন তা যদি তিনি ধরে রাখতে পারেন, তাহলে তিনি প্রতিনিধি পরিষদ এবং সিনেট উভয় স্থানেই তার দলের অবস্থান আরো শক্তিশালী করতে সক্ষম হবেন। অর্থনৈতিক ইস্যুগুলোর কারণে যদি তার অনুমোদনের হার দ্রুত পড়েও যায়, তাহলে ধারণা করা যায় যে পরিষদে গত দশক জুড়ে রিপাবলিকান দলের যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে তাও তার সাথে সাথে নেমে আসবে।

জাতীয় ইস্যুগুলো যদি ক্রমশঃ কংগ্রেস নির্বাচনের আরো গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে তাহলে ২০০৪ সালের সবচাইতে জোরালো বিষয় হবে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীগণ এবং তাদের নীতি বিষয়ক প্রচারণা। এই বিষয়ে পূর্বাভাস দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পক্ষে কে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হচ্ছেন তা এখনই বলা মুশকিল, কারণ বহু প্রার্থীই মনোনয়ন চাইছেন এবং সবাইকে ছাপিয়ে এককভাবে কেউই উঠে আসতে পারেননি। (এই নিবন্ধটি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার শুরুর দিকে রচিত। বর্তমানে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কনভেনশনে জন কেরির মনোনয়ন লাভ এখন আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।) এই মুহূর্তে তাই আমরা সঠিকভাবে বলতে পারছি না যে একজন উদার না মধ্যপন্থী, অথবা যুদ্ধের পক্ষে নাকি যুদ্ধ-বিরোধী কোন প্রার্থী ডেমোক্র্যাটিক দলের টিকেট লাভ করবেন। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট বুশ যদি মনে করেন যে তিনি আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, তাহলে আমরা নিশ্চিত যে তিনিই পুনরায় তার দলের মনোনয়ন লাভ করবেন।

এই সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল যে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিই ২০০৪ সালের মূল ইস্যু হিসেবে পুনরায় উদ্ভুত হবে। তবুও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধই বৈদেশিক নীতি বিষয়ে প্রাধান্য বজায় রাখবে। বিগত কিছু বছর যাবৎ -- সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকেই -- আন্তর্জাতিক সমস্যা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বড় ধরনের গুরুত্ব পেয়ে আসছে এবং দুই পক্ষ তাদের বিতর্ক কিভাবে সাজাবে এবং জনগণ সেক্ষেত্রে কি প্রতিক্রিয়া দেখাবে তা অতি অনিশ্চিত ব্যাপার। তবে, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যে ভোটারদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পাবে। তবে একথা আবারো বলতে হচ্ছে যে পুরো বিষয়টি এখনো

অনিশ্চিত, এক্ষেত্রে দেশের অর্থনীতির সূচক যদি উর্ধ্বমুখী হতে শুরু করে এবং রিপাবলিকানদের পক্ষে যায়, অথবা আরো দুর্বল হতে থাকে বা এমনকি অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় তাহলে ডেমোক্র্যাটিক দলের পুনরুদ্ভবের জন্য অর্থনীতি একটি ইস্যু হয়ে উঠবে।

সব মিলিয়ে ২০০৪ সালে প্রতিনিধি পরিষদ এবং সিনেটের দলীয় নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকির মুখে। কারণ এ দু'টি সভায় দল দু'টির শক্তি প্রায় কাছাকাছি। আমেরিকার গণতন্ত্রের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হবে এ দু'টি সভায় কোন দলের নিয়ন্ত্রণ থাকবে তার ওপর। আবার কোন দলই নিষন্ত্রণ প্রতিষ্ঠ করতে ব্যর্থ হতে পারে। এই অনিশ্চয়তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এই কারণে যে দুই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর প্রতি জনগণের প্রতিক্রিয়ার ঢেউ লাগতে পারে কংগ্রেস নির্বাচনেও। একই সঙ্গে এ বিষয়টিও গুরুত্ব পাবে যে ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কারা হবেন, তারা কোন মতবাদ সমর্থন করবেন এবং তাদের প্রতি জনগণের মনোভাব কি হবে। এই সকল বিষয়ই ২০০৪ সালের নির্বাচনকে চমকপ্রদ করে তুলেছে।

==========

**Election 2004* পুস্তিকা থেকে অনূদিত।

জিআর/ ১৪ই অক্টোবর, ২০০৪

নির্বাচন ২০০৪ সময়সূচী

প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রাথমিক নির্বাচন, ককাস এবং সনদ মনোনয়নের তারিখ

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বাছাই করার জন্য পার্টি ককাস এবং এবং প্রাইমারি নির্বাচনগুলো অতীব জরুরী। আগামী ২০০৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য যে সকল প্রাইমারি ও ককাসের তারিখ ও সময় নির্ধারিত হয়েছে এই ক্যালেন্ডারে তার তালিকা দেয়া হলো। ককাস-এর স্থান দেখানো হয়েছ ইটালিক্স-এ।

এই প্রেক্ষিতে একটি "ককাস" বলতে সাধারণতঃ বোঝায় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া চলাকালে প্রতিটি দলের স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীদের রাজ্যওয়ারি সমাবেশ। ককাস ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিনিধিদের পছন্দের মাধ্যমে প্রতিটি রাজ্যের পার্টি সদস্যদের দ্বারা কোন প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে তারা পছন্দ করছে তা ইঙ্গিত করা। প্রাইমারিগুলোর কাজও প্রায় একই ধরনের, কিন্তু সেগুলো কোন নির্দিষ্ট সরকারী পদের জন্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য অনুষ্ঠিত রেজিস্টার্ড ভোটারদের সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠান। রাজ্যের আইনের ওপর ভিত্তি করে ভোটারগণ তাদের পছন্দ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী অথবা প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট দিয়ে থাকেন এবং এই প্রতিনিধিরাই পার্টির কনভেনশনে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে সমর্থন দানের জন্য "প্রতিশ্রুতিবদ্ধ" থাকেন।

১৯শে জানুয়ারি
আইওয়া

২৭শে জানুয়ারি
নিউ হ্যাম্পশায়ার

৩রা ফেব্রুয়ারি
অ্যারিজোনা
ডেলাওয়্যার
মিসৌরি
ওকলাহোমা
সাউথ ক্যারোলাইনা (ডেমোক্র্যাটিক)
নিউ মেক্সিকো (ডেমোক্র্যাটিক)

৭ই ফেব্রুয়ারি
মিশিগান (ডেমোক্র্যাটিক)

৮ই ফেব্রুয়ারি
মেইন (ডেমোক্র্যাটিক)

১০ই ফেব্রুয়ারি
টেনেসি
ভার্জিনিয়া
ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া (রিপাবলিকান)

১৪ই ফেব্রুয়ারি
ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া (ডেমোক্র্যাটিক)
নেভাডা (ডেমোক্র্যাটিক)

১৭ই ফেব্রুয়ারি
উইসকনসিন

২৪শে ফেব্রুয়ারি
ইউটাহ্ (ডেমোক্র্যাটিক)
হাওয়াই
আইডাহো

২রা মার্চ
ক্যালিফোর্নিয়া
কানেক্টিকাট
জর্জিয়া
মেরিল্যান্ড
ম্যাসাচুসেট্স
নিউ ইয়র্ক
ওহাইয়ো
রোড আইল্যান্ড
ভার্মন্ট
ওয়াশিংটন
মিনেসোটা

৯ই মার্চ
ফ্লোরিডা
লুইসিয়ানা
মিসিসিপি
টেক্সাস

১৩ই মার্চ
ক্যানসাস (ডেমোক্র্যাটিক)

১৬ই মার্চ
ইলিনয়

২০শে মার্চ
আলাস্কা (ডেমোক্র্যাটিক)
ওয়াইওমিং (ডেমোক্র্যাটিক)

১৩ই এপ্রিল
কলোরাডো (ডেমোক্র্যাটিক)

২৭শে এপ্রিল
পেনসিলভানিয়া

৪ঠা মে
ইন্ডিয়ানা
নর্থ ক্যারোলাইনা

৬–৮ই মে
ওয়াইওমিং (রিপাবলিকান)

১১ই মে
নেব্রাস্কা
ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া

১৫ই মে
ওয়াইওমিং (ডেমোক্র্যাটিক)

১৮ই মে
আরকানসাস
কেন্টাকি
অরিগন

২৫শে মে
আইডাহো

১লা জুন
অ্যালাবামা
নিউ মেক্সিকো
সাউথ ডাকোটা

৮ই জুন
মন্টানা
নিউ জার্সি

২৬-২৯শে জুন
ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল
কনভেনশন, বস্টন

৩০শে আগস্ট-২রা সেপ্টেম্বর
রিপাবলিকান ন্যাশনাল
কনভেনশন, নিউ ইয়র্ক সিটি

==========

**Election 2004* পুস্তিকা থেকে অনূদিত।

জিআর/ ১৪ই অক্টোবর, ২০০৪

জরিপ, পন্ডিতবর্গ এবং নির্বাচন ২০০৪

জন জগবি

অনেক আমেরিকানই রাজনৈতিক জরিপ ভালোবাসেন। আর অন্যরা ভালোবাসেন সেগুলো ঘৃণা করতেই। যারা জরিপ ভালোবাসেন তারা রাজনীতির খেলাও উপভোগ করেন -- কে এগিয়ে আছে, জয় লাভের সম্ভাবনা কার বেশি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা অথবা অর্থনৈতিক খাতে কার অবস্থান সবচাইতে জনপ্রিয়। রাজনীতির এসব ওঠানামার খেলা যারা উপভোগ করেন সেই "রাজনৈতিক জাঙ্কি"রা প্রেসিডেন্ট, গভর্নর এবং মেয়রগণ কিভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন সেগুলোর রেটিং-এর দিকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে নজর রাখেন। আর বহু ভোটারই তাদের গোষ্ঠীতে অথবা দেশে যারা এই সমস্ত খোঁজ খবর রাখেন তাদের সাথে যুক্ত থাকার ধারণাটি পছন্দ করেন। যে যুগে অনেক বেশি আমেরিকানরা তাদের কর্মক্ষেত্রের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে আটকে থাকে অথবা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করে, সেই সময়ে এই সকল নির্বাচনী জরিপ নাগরিকদেরকে এক ধরনের বন্ধনে জড়ায়, তারা উপলব্ধি করে যে তারা একই জাতীয় গোষ্ঠীর অংশ।

যারা এই সব জরিপ পরিচালনা করে থাকে তাদের পেশাটা একটু বিতর্কিত। আমাদেরকে প্রায়ই এই বলে অভিযুক্ত করা হয় যে ভোটারদেরকে প্রভাবিত করার জন্য আমরা বিভিন্ন প্রার্থী এবং ইস্যুর ভিত্তিতে জনমতের ওঠানামা পরিমাপ করার পরিবর্তে বেশি বেশি করে থাকি, এবং তা শেষ পর্যন্ত ভোটার উপস্থিতিকে প্রভাবিত করে। কিন্ত একজন পেশাদার জনমত জরিপকারী হিসেবে আমার গত দুই দশকের অভিজ্ঞতায় আমি দেখতে পেয়েছি যে যারা সবচাইতে জোরেসোরে জরিপের বিরোধিতা করে তারাই সবার চাইতে আগে জরিপের সব সংখ্যা বলে দিতে পারে।

জরিপ: তখন এবং এখন

একটা সময় ছিল যখন মাত্র একটি বা দুইটি জরিপকারী সংস্থা মধ্যমঞ্চ মাতিয়ে রাখতো। আর আজকের দিনে, এই তাৎক্ষণিক সংবাদের যুগে ইন্টারনেট এবং ২৪ ঘন্টাব্যাপী কেব্‌ল নিউজ চ্যানেলগুলোর বদৌলতে বড় বড় সংবাদগুলোর মাঝখানে যে ফাঁক থাকে তা ভরিয়ে রাখে বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত বা কমিশন করা অথবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মতামত জরিপকারী সংস্থাগুলো।

যদিও পেনসিলভানিয়ার হ্যারিসবার্গের স্থানীয় একটি সংবাদপত্র ১৮২৪ সালে প্রথম রাজনৈতিক জরিপটি পরিচালনা করে, কিন্তু ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত সংবাদ মাধ্যমগুলোর রাজনৈতিক প্রচারণার সংবাদ প্রচার ও পরিবেশনায় স্বাধীন জরিপগুলো প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়ায়নি। সবার আগে এবং সবচাইতে আধুনিক জরিপ যারা পরিচালনা করেছিল তারা হলো গ্যালাপ এবং রোপার। পরবর্তীতে এই দু'টির সাথে যোগ দেয় সিন্ডলিঞ্জার, ইয়াঙ্কেলোভিচ, এবং হ্যারিসের মতো যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়াও, ১৯৭০-এর দশকের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি বৃহৎ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক যারা সংবাদ পরিবেশনা করে থাকে পেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় তারা তাদের নিজস্ব জরিপ পরিবেশন করতো। ঠিক এর পর পরই তারা বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নরের অফিস এবং যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনগুলোর ওপরেও জরিপ পরিচালনা করতো।

সংবাদ মাধ্যমগুলো যেসব জরিপ পরিচালনা করে থাকে -- কোন নিউজ নেটওয়ার্ক এবং তাদের অংশীদার কোন সংবাদপত্রের নামে যেগুলো পরিচালত হয় (যেমন, সিবিএস/নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স, এবিসি/ওয়াশিংটন পোস্ট, এনবিসি/ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল) -- সেগুলো রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে যে সব প্রার্থী তাদের পরিচালিত জরিপ থেকে আলাদা হয়ে থাকে। আর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এবং তাদের অংশীদারদের করা এই সব জরিপ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দু'টির মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমগুলোর করা জরিপগুলো হচ্ছে সাধারণ জনগণকে নিয়ে এবং এগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন্ প্রার্থীরা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্য কাদের চেয়ে এগিয়ে আছে তা জনগণকে অবহিত করা। এগুলোকে নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনভাবে পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এই ধরনের নিরপেক্ষতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই জরিপ প্রার্থীদেরকে তাদের নিজেদের করা "ব্যক্তিগত" জরিপ-এর মাধ্যমে শঠতা করা থেকে বিরত রাখে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, যেমন এক জন প্রার্থী কোন এক সময় দাবী করতে পারেন যে তার ব্যক্তিগত জরিপে দেখা গেছে যে তিনি অন্যদের চাইতে এগিয়ে আছেন, অন্যদিকে প্রথাগত ধারণা তার উল্টোটাই বলে। বিগত কয়েক দশকে দেখা গেছে, স্বাধীনভাবে

পরিচালিত রাজনৈতিক জরিপ নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করেছে, এসব জরিপে প্রতিটি প্রার্থীর সবল এবং দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে পরিমাপ করা হয়েছে এবং যেখানে যে ধরনের জনগোষ্ঠী প্রতিটি প্রার্থীকে সমর্থন করছে তাদের সম্পর্কেও পরীক্ষ-নিরীক্ষা করা হয়েছে। এধরনের নিরপেক্ষ জরিপ রিপোর্টার এবং সম্পাদকদেরকে নির্বাচনী প্রচারণার অবস্থান বিষয়ে সঠিক অনুমানের ভিত্তিতে রিপোর্ট করতে উদ্বুদ্ধ করে।

স্বাধীন জরিপে যে ধরনের স্বচ্ছতা দেখতে পাওয়া যায় তা পাঠক এবং দর্শকদেরকেও একটি উপকারী ও উপযোগী সেবা প্রদান করে। কিন্তু এতো কিছু সত্ত্বেও স্বাধীন জরিপও অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। ১৯৯৬ সালে রিপাবলিকান দলের সাবেক সিনেট নেতা বব ডোল প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। ক্লিনটন সে সময় ডেমোক্র্যাট দলের ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সে সময় পুরো নির্বাচনী প্রচারণার বেশির ভাগ জরিপেই দিখা যাচ্ছিল যে ডোল পুরো সময়টাতেই শতকরা ২৫ ভাগ পিছিয়ে আছেন। রয়টার্সের জন্য আমার নিজের করা জরিপে দেখা গেল যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ জোরালোভাবেই চলছে -- ডোল খুব বেশি হলে ৭ থেকে ১২ পয়েন্ট পিছিয়ে আছেন। ওই নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্যান্য সংস্থার নেটওয়ার্ক এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলোর জরিপ মিডিয়া কাভারেজ-কে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। আর তাই, প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে ডোলকে প্রেসিডেন্টের চাইতে "কমপক্ষে শতকরা ২৫ ভাগ পিছিয়ে পড়া" প্রার্থী হিসেবে উল্লেখ করা হতো। যখন কেবলমাত্র একপেশে ও ভারসাম্যহীন জরিপগুলোকে কাভারেজের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, এগুলো রিপোর্টিংকে একদম একপেশে করে ফেলতে পারে, কোন ফলাফলের পূর্বাভাস দিতে পারে, এবং তারপর নিজেই নিজেতে পরিপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে যেতে পারে। এর ফলে প্রার্থীদের চাঁদা তোলার কাজটা সহজ হয় না এবং কোন সুষ্ঠু শুনানি সে পায় না।

এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে নির্বাচন-পূর্ববর্তী জরিপ প্রকৃতপক্ষেই ভোট দিতে আসা ভোটারের সংখ্যা এবং/অথবা নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে? সাধালণভাবে এর সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে না। যদিও ডোল-ক্লিনটন মিডিয়া কাভারেজ সিনেটর ডোলের জন্য মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, এর কোন জোরালো প্রমাণ নেই যে সিনেটর ডোল নির্বাচনে জয় লাভ করতে পারতেন। এমনকি এর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণও নেই যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতামুলক নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় কোন প্রার্থী কেবল নির্বাচন-পূর্ববর্তী জরিপের কারণে হেরেছে যে জরিপে তাকে পিছিয়ে পড়া হিসেবে দেখানো হয়েছে।

তবে কেউ কেউ অত্যন্ত জোরের সাথে বলে থাকেন যে বর্তমানে জরিপের সংখ্যা খুব বেশি -- এই 'পোল'-কে বলা হয়ে থাকে তথাকথিত "ঢ়ড়ষষ-ঁঃরড়হ"। আমি ২৪ ঘন্টাব্যাপী কেব্‌ল নিউজ

নেটওয়ার্কগুলোর কথা এবং সেগুলোর বড় বড় সংবাদের মাঝের ফাঁকগুলো ভরাট করার কথা উল্লেখ করেছি। রাজনৈতিক জরিপের বিস্তারের এটা আরেকটা প্রধান কারণ। সংবাদ সংস্থাগুলোর মধ্যকার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্রই এর আরেকটি কারণ। ২০০০ সালে নির্বাচনী প্রচারণার সময়ে কমপক্ষে ১৪টি প্রধান স্বাধীন জরিপ পরিচালিত হতো এবং সেগুলোর ফলাফল সব সময় এক ধরনের হতো না। কিন্তু ভোটারদের এতে অভিযোগ করা উচিত নয় -- তাদের অবশ্যই পছন্দ করার সুযোগ ছিল এবং জরিপগুলো দেখার সময় ভোটারদের ভালো ভোক্তা হওয়া প্রয়োজন, যেমনটি তারা কোন গাড়ি অথবা বাড়ি কেনার সময় বিচার করে থাকে। জরিপ করার সময় কিছু মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করতে হয় এবং তা কিভাবে করতে হয় সে ব্যাপারে আমার নীতিমালা আমি এখানে তুলে ধরলাম।

জনমত যাচাইয়ের নমুনা

প্রেসিডেন্টের বার্ষিক স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন অ্যাড্রেস অথবা রাজনৈতিক দায়িত্বের জন্য প্রার্থীদের মধ্যে বিতর্কের মতো বড় ঘটনার পর মাঝে মাঝে রাতারাতি জরিপ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। পরের দিন দ্রুত প্রকাশের জন্য প্রায়শঃই এই জরিপগুলো এক রাতের মধ্যে করা হয়ে থাকে এবং পুরো দেশব্যাপী মাত্র ৫০০ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এই নমুনা জরিপ চালানো হয়ে থাকে। যদিও এই "রাতারাতি" জরিপগুলো জনতার প্রতিক্রিয়ার একটা তাৎক্ষণিক রিডিং দিয়ে থাকে, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে এগুলো ত্রুটিপূর্ণ।

প্রথমতঃ, মাত্র ৫০০ জন নাগরিকের একটি নমুনা জরিপ ২৮ কোটি নাগরিকের একটি জাতিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার জন্য অতি ক্ষুদ্র। এটা শতকরা ৯৫ ভাগ সময়ে সঠিক হতে পারে, এর সাথে ৪.৫ ভাগ যুক্ত হতে পারে বা বাদ যেতে পারে, কিন্তু তা প্রেসিডেন্ট বা কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য নির্বাচনের পূর্বাভাস দেয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। উপরন্তু, ৫০০ জনের এই যে নমুনা, তা আমার দৃষ্টিতে একটি রাষ্ট্রীয় বা গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সাবগ্রুপ বিশ্লেষণ করার মতো পরিসংখ্যান দেবার জন্য যথেষ্ট নয়।

এছাড়া আরো অনেক পদ্ধতিগত সমস্যাও রয়েছে। একটি এক-রাতে করা নমুনা জরিপ অর্থ এই যে একটি বড় অংশের প্রতিনিধিত্ব করছে এমন জনগোষ্ঠীর কেউই তখন হয়তো বাড়িতে নেই। যদিও জরিপকারীরা এই বিষয়ে ওপর গুরুত্ব প্রয়োগ করবে যে তাদের নমুনা জরিপ জনসংখ্যার সব অংশের মতামতকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করছে, এই গুরুত্ব দানের প্রক্রিয়া সব সময় এমন হবে না যে যেগুলোর কম প্রতিনিধিত্ব রয়েছে এতে করে সেই সব গোষ্ঠীগুলোর ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া যাবে। যেমন, রাতারাতি করা একটি জরিপে আফ্রিকান-আমেরিকানদের প্রতিনিধিত্ব থাকলো না। অথবা, অন্য কোন রাতে কোন জরিপে

নেব্রাস্কা অথবা ক্যানসাসের বেশির ভাগ আফ্রিকান-আমেরিকানদেরই মতামত নেয়া হলো, এবং নিউ ইয়র্ক, মিসিসিপি অথবা সাউথ ক্যারোলিনা থেকে যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব থাকলো না।

এই সব দ্রুত করা জরিপের আরেকটি সাধারণ সমস্যা হলো যে এগুলোতে "সম্ভাব্য ভোটারদের" পরিবর্তে "প্রাপ্তবয়স্ক"দের জরিপ করা হয়। এই দুই দলের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে। সাধারণত, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সংখ্যালঘু, নিম্ন-আয়ের পরিবারের লোকজন এবং ইউনিয়নের সদস্যরা থাকতে পারে। এই সব গ্রুপগুলোর প্রত্যেকেই ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং এর প্রার্থীর প্রতি অনুরক্ত -- এর ফলে জরিপে তাদের প্রতিনিধিত্ব বেশি থাকলে স্বাভাবিকভাবে ফলাফল অন্য রকম হবেই তা ধরে নেয়া যায়।

তাহলে আপনারা কোন নমুনা জরিপের আকার এবং এর সজ্জা দেখুন। যুক্তরাষ্ট্রে একটি সুষ্ঠু দেশব্যাপী জরিপে কমপক্ষে ১,০০০ সম্ভাব্য ভোটারকে প্রশ্ন করা হয় এবং তিন পয়েন্টের কম অথবা বেশি 'মার্জিন অব স্যাম্পলিং এরর' দেখানো হয়।

যখন একটি জয় কোন জয় নয়

মোনা লিসা অথবা এই বিশ্বের বৃহৎ কোন সাহিত্যকর্মের মতো সবচেয়ে সুক্ষ্মভাবে করা জরিপেরও অনেক ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে। সাংবাদিক এবং পন্ডিতগণ যারা এসব জরিপ পড়ে থাকেন, এগুলোও তাদের মনে কিছু নির্দিষ্ট ধরনের প্রত্যাশার জন্ম দেয়। আর এই ভাবেই যারা জরিপ করেন তারা এবং পন্ডিতরা সেই মায়াবী জীবের জন্ম দেয় যা "প্রথাগত জ্ঞান" নামে পরিচিত। প্রার্থীদেরকে এই প্রথাগত জ্ঞান উপেক্ষা করতে দেখতে দুই দলই ভালোবাসেন। তাই এমন প্রার্থীদের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ যারা 'প্যাক' থেকে উঠে এসেছেন। প্রথম দিককার জরিপের ফলাফলে তাদের হয়তো তেমন কোন অস্তিত্বই ছিল না।

উদাহরণ হিসেবে সিনেটর ইউজিন ম্যাকার্থির ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে তার নিজের ধর্মযুদ্ধ এবং ১৯৬৮ সালে প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনের বিরুদ্ধে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলা যেতে পারে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রে তখন যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠছিল, কিন্তু কেউই ভাবতে পারেনি যে মিনেসোটা থেকে আগত একজন স্বল্প-পরিচিত সিনেটর ক্ষমতাশালী প্রেসিডেন্ট জনসনের প্রতি মারাত্মক কোন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারে। কিন্তু প্রথম প্রাইমারি (নিউ হ্যাম্পশায়ার) প্রতিযোগিতার পর যখন ভোট গণনা করা হলো দেখা গেল যে জনসনের ৪৯ শতাংশ ভোটের মধ্যে ম্যাকার্থি লাভ করেছেন ৪১ শতাংশ ভোট। যদিও প্রেসিডেন্টের নাম ব্যালটে ছাপা ছিল না এবং যারা প্রেসিডেন্টকে ভোট দিতে চেয়েছিল তাদেরকে তার নাম হাতে লিখে দিতে হয়েছিল, কিন্তু পন্ডিতরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে প্রাক-নির্বাচনী জরিপগুলো থেকে যে ধরনের প্রত্যাশা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ম্যাকার্থি যেহেতু তার সকল কিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন তাই তারা তাকেই বিজয়ী ঘোষণা করলেন।

ম্যাকার্থির এই "বিজয়" পুরো রাজনৈতিক বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল এবং পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রেসিডেন্ট পুনরায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নেন।

প্রায় একই ধরনের পন্ডিত-ঘোষিত বিজয়ের ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭২ সালে নিউ হ্যাম্পশায়ার রাজ্যের ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রাইমারিতে। সাউথ ডাকোটার সিনেটর জর্জ ম্যাকগভার্ন যিনি ১৯৬৮ সালে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য যুদ্ধ-বিরোধী ধ্বজা ধারণ করেছিলেন এবং এরপর ডেমোক্র্যাটিক দলের মধ্যে একটি সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সিনেটর এডোয়ার্ড মাস্কির প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন যিনি সেসময় প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন লাভে স্পষ্টতঃই সবার চাইতে এগিয়ে ছিলেন। ম্যাকগভার্নের ব্যক্তিগত জরিপে দেখা যাচ্ছিল যে তিনি নিউ হ্যাম্পশায়ারের প্রাইমারি ভোটের শতকরা ৪০ ভাগ ছাড়িয়ে যেতে পারেন। তাই তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে সংবাদ মাধ্যমগুলোকে জানালেন যে সেখানে ৩৫ শতাংশ ভোট দেখালেই তিনি খুশি হবেন। যখন তিনি মাস্কি-র ৪৮ শতাংশ ভোটের পাশাপাশি ৪৩ শতাংশ ভোট লাভ করলেন, প্রেস বোঝাতে চেষ্টা করলো যে (১৯৬৮ সালের মতোই) চ্যালেঞ্জার পন্ডিতদের সকল প্রত্যাশা ছাড়িয়ে "জিতে" গিয়েছেন। ইতিহাসবিদদের মতে, ১৯৬৮ সালের মতোই এই "বিজয়" ম্যাকগভার্নকে নিউ হ্যাম্পশায়ারে জয়লাভের সবচাইতে বড় সুবিধা এনে দিয়েছিল: মিডিয়া (সংবাদ মাধ্যম), মানি (অর্থ) এবং মোমেন্টাম (গতি)। এরপর ম্যাকগভার্ন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন লাভ করতে থাকেন যদিও তিনি চূড়ান্ত নির্বাচনে রিচার্ড নিক্সনের কাছে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজয় বরণ করেন। ১৯৭৬ সালে জর্জিয়ার সাবেক গভর্নর জিমি কার্টার সর্ব প্রথম ওয়াশিংটন প্রেস বাহিনী কর্তৃক "জিমি হু" নামে অভিহিত হয়েছিলেন। আরো পাঁচজন সুপরিচিত ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীর বিরুদ্ধে কার্টারের শতকরা ২৮ ভাগ ভোটই যথেষ্ট ছিল তাকে ফ্রন্ট-রানারের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে এবং চূড়ান্ত মনোনয়ন লাভ করতে।

এই সকল ঘটনা থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা হলো এই যে এসব প্রাক-নির্বাচনী জরিপ কোন ফ্রন্ট-রানারের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে অথবা তাকে দমিয়ে দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। বস্তুত, জরিপ প্রচারণার কাভারেজের জন্য মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং কে বিজয়ী হবেন সে ব্যাপারে প্রচলিত ধারণা সম্পর্কেই ধারণা দিয়ে থাকে।

এক্সিট পোল্‌স

সেই ১৯৭০-এর দশক থেকে এক্সিট পোল-গুলো যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় এবং রাজ্য নির্বাচনের একটি প্রধান বিষয়। এই জরিপগুলো আজকের দিনে পরিচালিত সবচাইতে বিতর্কিত কারণ এই জরিপে নির্বাচনের সময়ে যে সকল ভোটার মাত্র ভোট দিয়ে বের হয়েছেন তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের

ফলাফল সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই এক্সিট পোল বিশেষভাবে কুখ্যাতি লাভ করে ২০০০ সালের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় যখন এগুলো টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলো দ্বারা অপব্যবহৃত হয়েছিল। ফ্লোরিডার ভোটারগণ বিজয়ী হিসেবে কাকে বাছাই করেছিল তা জানাতে একটি নয়, বরং দু'টি ভুল পূর্বাভাস করেছিল।

তবে এক্সিট পোল যখন সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়, জরিপকারীদের জন্য, সংবাদ মাধ্যম, এবং শিক্ষাবিদদের জন্য তা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। নির্বাচনের রাতের শুরুর দিকে বিজয়ী কে হবেন সে সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়া ছাড়াও সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীগুলো কিভাবে ভোট দিল এবং তাদের ভোট প্রদানের কি কারণ তারা জানালো সে ব্যাপারেও এক্সিট পোল বিশেষজ্ঞ এবং রাজনীতি বিজ্ঞানীদেরকে বিস্তারিত জানায়। এছাড়া ভবিষ্যতের নির্বাচনগুলোতে ভোটার টার্নআউট মডেল কি হবে সে সম্পর্কেও জরিপকারীদের একটা ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করে -- অর্থাৎ, প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কতো লোক ভবিষ্যতের কোন নির্বাচনে ভোট প্রদান করতে আসতে পারে সে ব্যাপারে তারা একটি ধারণা লাভ করে। নীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে ভবিষ্যতের ভোটার নমুনা যাতে প্রতিনিধিত্বশীল হয় তা নিশ্চিত করার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এক্সিট পোল তখনই সমস্যার সৃষ্টি করে যখন কোন বিজয়ীর ব্যাপারে পূর্বাভাস দেয়ার জন্য এগুলো ব্যবহৃত হয়। একটি এক্সিট পোল-এ নমুনা গ্রহণের প্রক্রিয়া যতো ভালই হোক না কেন, এটা নমুনাই মাত্র, যার অর্থ হচ্ছে এখানে ভুল হবারও সম্ভাবনা রয়েছে। এই বিষয়টি তেমন কোন গুরুত্ব বহন করে না যখন দুই প্রার্থীর মধ্যে ব্যবধান বিশাল হয়। কিন্তু একটি অতি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনে এক অথবা দুই পয়েন্টের 'মার্জিন অব এরর' অনেক বড় ব্যাপার হয়ে দেখা দেয়। ২০০০ সালে প্রাক-নির্বাচন জরিপ এবং নির্বাচনের সারা দিনের এক্সিট পোল-এর ওপর ভিত্তি করে সে সময় এমন কোন বৈধ উপায় ছিল না যাতে করে সব ভোট গণনা শেষ হবার আগেই টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলো বলতে পারতো যে জর্জ ডব্লিউ বুশ অথবা আল গোর কে ফ্লোরিডা রাজ্যে জয় লাভ করেছেন। সবার আগে পূর্বাভাস দেয়ার যে চাপ তা-ই সেই পূর্বাভাসকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য চাপ দিয়ে থাকে।

একজন পেশাজীবী জরিপকারীর এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী একটু অদ্ভুতই মনে হতে পারে, কিন্তু আমি মনে করি যে ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে এক্সিট পোল নিয়ে যা ঘটেছিল তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃত ফলাফল হাতে না এসে পৌঁছানো পর্যন্ত নির্বাচনে যে জয় লাভ করলো তা আমাদের আসলেই জানার প্রয়োজন নেই। কারা ভোট দিতে গিয়েছিল এবং তারা যে ভোট দিয়েছে তা কেন দিয়েছে

-- নির্বাচনের দিন সন্ধ্যাবেলায় কেবলমাত্র তা জানার মধ্যে এক্সিট পোল সীমিত রাখলে নির্বাচন প্রক্রিয়া আরো উন্নত হবে।

জরিপ শিল্প কি সংকটের মুখে?

জরিপে সাড়া দেয়ার হার কমে যাওয়ার কারণ নিয়ে আজকাল বিস্তর আলোচনা হয়ে থাকে। আমি যখন এই পেশায় কাজ করতে শুরু করি সে সময় জরিপে সাড়া দেয়ার হার ছিল ৬৫ শতাংশ -- অর্থাৎ প্রতি তিনজন যাদেরকে ফোনে যোগাযোগ করা হতো, তাদের মধ্যে দু'জন জরিপে জবার দিতে রাজি হতো। বর্তমানে, গত সাড়া দেয়ার হার কমে দাঁড়িয়েছে ৩০ শতাংশে এবং বিশেষ করে কোন কোন মেট্রোপলিটান এলাকায় এই হার আরো কম। আর এই কারণে জরিপ শিল্প যে মৃত তা ঘোষণা দেয়ার জন্য কিছু কিছু পন্ডিত এখনই প্রস্তুত। কিন্তু এটা একেবারেই সঠিক নয়। জরিপে সাড়া দেয়ার হার কম হবার অর্থ হচ্ছে জরিপ সম্পন্ন করতে অনেক সময় বেশি লেগে যায়, কিন্তু ভালো নমুনা পাওয়া এখনো সম্ভব।

যদিও কিছু কিছু জরিপ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়েছে -- এর মধ্যে আমার প্রতিষ্ঠানও রয়েছে -- এরা কিছু প্রধান নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে ভুল করেছে। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে আমরা সবাই সাধারণতঃ 'মার্জিন অব স্যাম্পল এরর'-এর মধ্যে ফলাফল পেতে পারি। এখন যেহেতু ২০০৪ সালের আরেকটা বড় নির্বাচনের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি ও সেজন্য সকলে প্রস্তুতি নিচ্ছি তাই আমি মনে করি যে জরিপ কি করতে পারে এবং কি করতে পারে না সে ব্যাপারে ভোক্তার রাজনৈতিক তথ্যের সাথে সুস্থ সন্দেহবাদের যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশাই গ্রহণ করবার সর্বোত্তম উপায়।

==========

**Election 2004* পুস্তিকা থেকে অনূদিত।

জিআর/ ১৪ই অক্টোবর, ২০০৪